অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত

স্বাধিকার

THE SWADHIKAR

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

বুলেটিন নং: ৪১, বর্ষ: ১২, সংখ্যা: ৫, প্রকাশ কাল: ৩১ অক্টোবর ২০০৬, শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা $ 5, ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট, www.updfcht.org, Email: updfcht@yahoo.com

অনিশ্চয়তার রাহুগ্রাসে বাংলাদেশ

॥ সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৩০ অক্টোবর ॥

বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ এখন ঘোর কালো মেঘে আচ্ছন্ন। গতকাল রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দীন আহমেদ তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেয়ার পরও সংকট কাটেনি। বরং প্রবল ঝড়ের আগে যেভাবে গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করে, রাষ্টপতির এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেই ধরনের পরিস্থিতিরই সৃষ্টি করেছে। ঘনীভূত অনিশ্চয়তার কালো মেঘ কেটে না গেলে যে কোন সময়ই প্রবল সংকটময় রাজনৈতিক ঝড়ের আশঙ্কা। তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি মহাসচিবের মধ্যে ৫ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলা ৬ দফা সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২৭ অক্টোবর বিএনপি-জামাত নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষণ ঘনিয়ে আসার সাথে সাথেই নতুন রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। ঐদিন থেকে চলা দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও হামলা পাল্টা হামলায় গত তিন *৪র্থ পাতায় দেখুন*

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ৭ দফা দাবি মেনে নিন

ডেস্ক রিপোর্ট॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সাত দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ইউপিডিএফ-এর কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। গত ৫ অক্টোবর চট্টগ্রামে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দাবি তুলে ধরা হয় এবং দাবি আদায়ের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

সড়ক অবরোধ:

৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সর্বশেষ ২২ অক্টোবর খাগড়াছড়িতে অর্ধদিবস সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালিত হয়েছে। অবরোধ চলাকালে খাগড়াছড়ির সাথে চট্টগ্রাম ও থানা সদরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ইউপিডিএফ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে খাগড়াছড়ি পরিবহন মালিক ও শ্রমিকরা যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখেন। দুপুর ১২টার পর অবরোধ তুলে নেয়া হয়।

সড়ক অবরোধের আগে ইউপিডিএফ-এর ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় হা হলো ১১ অক্টোবর ৭ দফা দাবির সমর্থনে নাগরিক সভা, ১৭ অক্টোবর বিশাল জনসভা, ১২ থেকে ১৯ অক্টোবর খাগড়াছড়ির বিভিন্ন থানা ও অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় ও ২১ অক্টোবর তীর ধনুক মিছিল। এসব কর্মসূচী প্রাথমিকভাবে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়িতে পালন করা হয়েছে।

তীর ধনুক মিছিল:

৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের পক্ষে ২১ অক্টোবর "তীর ধনুক" মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। উপজেলা মাঠ থেকে দুপুর ১টায় মিছিল শুরু হয়ে শাপলা চত্বর মুক্ত মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। অতপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সভাপতি দীপংকর ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন সভাপতি সোনালী চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা ও ইউপিডিএফ সংগঠক অনিমেষ চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের অর্থ সম্পাদক কাহোচিং মারমা।

সমাবেশে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে অবিলম্বে ৭ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে বলেন, একটি বিশেষ মহল গত পাঁচ বছরে সরকারী অর্থ লুটপাট করার পর আবার ভোট ডাকাতির মাধ্যমে নির্বাচনে জেতার জন্য ষড়যন্ত্র করছে, নির্বাচনে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা খরচ করছে। তারা বলেন এ ষড়যন্ত্র কখনোই সফল হতে দেয়া হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যে কোন মূল্যে এই ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়ে জনগণের পক্ষের শক্তিকে জয়যুক্ত করবে।

জেলা নির্বাচন অফিস অভিমুখে মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ:

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ১৭ অক্টোবর ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা নির্বাচন অফিসারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপি প্রদানের আগে স্বনির্ভর মাঠ থেকে একটি বিশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মুক্ত মঞ্চ শাপলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। অতপর সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলে তাতে সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ সংগঠক ৭ম পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ইউপিডিএফ-এর সাত দফা দাবি:

১. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা; বহিরাগত সেটলার, সেনাবাহিনীর সদস্য ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যাতে সমতলে স্ব স্ব এলাকায় পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. নির্বাচনের কমপক্ষে তিন মাস আগে থেকে সেনাবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ রাখা; অপারেশন উত্তরণের নামে সাধারণ নিরীহ জনগণসহ ইউপিডিএফ-এর ওপর দমন পীড়ন বন্ধ করা ও প্রশাসনের ওপর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। ৭ম পাতায় দেখুন

কর্মসূচী:

ইউপিডিএফ-এর

প্রথম কংগ্রেস

২৬ - ২৮ নভেম্বর ২০০৬

গঠনের প্রায় ৮ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য পার্টির প্রথম কংগ্রেস সফল করতে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রত্যেক পার্টি সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থকসহ সকল স্তরের জনগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

-কেন্দ্রীয় কমিটি
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

"পেন পিন্যা-উনরে ঠিগ গরগোই"

গত ৮ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ১৫টি স্পটে এক যোগে গণব্রিফিং-এর আয়োজন করে। খাগড়াছড়ির শিবমন্দিরে অনুষ্ঠিত ব্রিফিং-এ ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ আগত মুরুব্বীদের উদ্দেশ্যে পার্টি কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। এ সময় জনৈক মুরুব্বী ইউপিডিএফ-কে পরামর্শ দিয়ে বলেন, "পেন পিন্যা-উনরে ঠিগ গরগোই, আমি লুঙ্গি পিন্যাউন ঠিগ আগিই।" (অর্থাৎ প্যান্ট পরা ভদ্রলোকদের ঠিক করেন, আমরা লুঙ্গি পরা লোকজন ঠিক আছি)।

আসলে উনার এই কথার যথার্থতা রয়েছে। বিগত তিন দশকের আন্দোলনে দেখা গেছে সাধারণ জনগণ অল্প কথায় সঠিক জিনিসটি বুঝতে পেরেছেন, ব্যক্তি লাভালাভের বিচার না করে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন, যে পার্টি বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে চেয়েছে তাকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন এবং তারাই আন্দোলনে আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। বিগত সংসদ নির্বাচনের সময়ও শহর ও গ্রামের এই সাধারণ লোকজনই হাজারে হাজারে পার্টির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। আগামী নির্বাচনেও যে তারাই পার্টির জয়লাভের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শিব মন্দিরের উক্ত ব্যক্তি "প্যান্ট-পরা" লোক বলতে যাদের বোঝাতে *২য় পাতায় দেখুন*

ই.ইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের সাথে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের আলোচনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সফরে আসা ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের প্রতিনিধির সাথে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনায় অংশ নেন ইউরোপীয় মিশনের অন্যতম সদস্য হান্নাহ রবার্টস। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্টি প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা, কেন্দ্রীয় সদস্য রবিশংকর চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক অংগ্য মার্মা।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি হান্নাহ রবার্টস পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইউপিডিএফ-এর মতামত জানতে চান। তিনি বলেন নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানতে চান নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের চ্যালেঞ্জসমূহ কি কি? তিনি *৭ম পাতায় দেখুন*

কারা জীবনের কিছু কথা

৫ম পাতার পর

জড়িয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেয়, যাদের কথা একটু আগে বলা হয়েছে। গ্রেফতারের আগে এদেরকে সেনারা নিজেরাই গাদা বন্দুক ব্যবহারের লাইসেন্স দিয়েছিল। পরে সেই গাদা বন্দুকগুলোসহ তাদেরকে ধরে পুলিশে দেয়। আমি খাগড়াছড়ি জেলে থাকার সময় তারা আমাকে এ কথা বলেছিল। তাদেরকে জেলে দেখার কেউ ছিল না। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে যাতে তাদের সম্পর্কে আমাদের বুলেটিনে লেখা হয় ও তাদের মামলাগুলো পরিচালনা করা হয়, সে জন্য বাজার ফর্দের অপর পৃষ্ঠায় তাদের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে জেলখানার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু সেটা বাইরে যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে এবং আমাকে উপরোক্ত শাস্তি দেয়া হয়।

খাগড়াছড়ি জেলে ৭ মাস থাকার পর ২০০৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর পার্টির অন্যতম সদস্য রঞ্জন মনি ও আমাকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার সম্পর্কে এর আগে আমার কোন ধারণা ছিল না। সহযোদ্ধা রঞ্জন মনি ১৯৯৮ সালে এই জেলে আট মাস ছিলেন। এখানে নিয়ে আসার পর আমাদের প্রথমে যথারীতি আমদানী ওয়ার্ডে রাখা হয়। আমাদের সাথে ছিলেন রঞ্জন কুমার ত্রিপুরা নামে গুইমারা থেকে একজন নিরীহ পাবলিক। তাকেও আমাদের সাথে চালান দেয়া হয়। খাগড়াছড়ি জেলে তার সাথে পাশাপাশি সিটে থাকতাম। আমদানীতে ঢোকানোর আগে অফিসে আমাদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হয় এবং জিনিসপত্র তল্লাশী করা হয়। খাগড়াছড়ি জেল থেকে আসার সময় আমাদের দু'জনের পকেটে দুই শ' টাকা করে ছিল। সেখান থেকে মাত্র বিশ টাকা খরচ করা হয়। বাকি টাকাগুলো অফিসে পি.সিতে জমা রাখা হয়। বের হবার সময় অনেক দেন দরকার করে ১৭০ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হই।

আমদানিতে বসার সাথে সাথে আমাদের পূর্ব পরিচিত পূর্ণেন্দু ও পাইচি মং আমাদের যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন। এছাড়া আমাদের পার্টি সদস্য জগদীশ ও অন্যান্যরা আমাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। যেভাবে আমাদের আপ্যায়ন করা হলো যেন আমরা কোন বিয়ে বাড়ির মেহমান। পরদিন আমাদের দু'জনকে ৩২ নং সেলে ৪০ ও ৪২ নং রুমে পাঠানো হয়। যাদের পাঁচ এর অধিক মামলা থাকে তাদেরকে সাধারণ নিরাপত্তা সেলে রাখা হয়। আমার ৭টি মামলা থাকায় আমাকেও নিরাপত্তা সেলে ৪০ নং ওয়ার্ডে দেয়া হয়। ওয়ার্ডে ঢোকার সাথে সাথে রুমে অবস্থানরত বন্দীরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা শুরু করে। আমিও সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করি। সকাল ৯ টা বা ১০টার দিকে ফাইলের সময় তত্ত্বাবধায়ক আমার মামলার সংখ্যা দেখে জানতে চান আমি কি করি। বললাম এক সময় শিক্ষকতা করতাম, এখন রাজনীতি করি। তারই পুরস্কার হিসেবে জুটেছে এই সব মামলা ।

নিরাপত্তা সেলে যে ভাবে রাখা হয় তা বর্ণনা করার মতো নয়। পাহাড়িরা যেভাবে মর্দ শুকর পোষে ঠিক সেভাবে আমাদেরকে ২৪ ঘন্টা রুমে রাখা হয়। এক মিনিটের জন্যও বারান্দায় বের করা হয় না। চট্টগ্রাম কারাগারে আগের চাইতে অনেক সুযোগ সুবিধা বাড়লেও ৩২ নং সেলে রয়েছে চরম পানির সংকট। খাওয়ার পানিও অপরিস্কার। সেখানে টিভি ও ফ্যান দেয়া হয়নি।

এই সেলে যে সব আসামী থাকে তাদের অধিকাংশই বলতে গেলে বদমায়েশ ও বেয়াদব ধরনের। এরা চোর, ডাকাত ও বড় বড় সন্ত্রাসী। তারা গাজা হিরোইন খায়। তবে যারা ইসলামী ছাত্র শিবির ও বহুল আলোচিত জেএমবি'র সদস্য তারা ব্যক্তিগতভাবে ভদ্র, যদিও তাদের সাথে আমার রাজনৈতিক আদর্শগত পার্থক্য আকাশ পাতাল। অপরদিকে, ছাত্র লীগ ও বিএনপির ছেলেরা অধিকাংশই মাস্তান ও অভদ্র। লোকজনের সাথে তারা ভালো আচরণ করতে শিখেছে বলে মনে হয় না। তাদের আচরণ দেখেই বোঝা যায় বাইরে থাকার সময় তারা কি করতো।

তিন রকম মানের খাদ্য চট্টগ্রাম জেলে পরিবেশন করা হয়। ১, ২ ও ৩২ নং সেলে এক রকম মানের, কনডেম সেলে আরো এক মানের এবং ভবনে অন্য এক মানের। রান্নার গুণগত মান ও পরিমাণেও পার্থক্য আছে। যেমন কনডেম সেলের জন্য যে সব খাদ্য দেয়া হয় তার মান সবচেয়ে ভালো। মানের দিক দিয়ে দ্বিতীয় হলো ১, ২ ও ৩২ নং সেলে দেয়া খাদ্য। সব চেয়ে বাজে, পরিমাণে কম ও খাওয়ার অযোগ্য খাদ্য দেয়া হয় ভবনে। তবে মহিলা ওয়ার্ড ও কিশোর ওয়ার্ড-এ কি ধরনের খাদ্য দেয়া হয় তা আমার অজানা। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে কি পরিমাণ দুর্নীতি ও অনিয়ম চলে তা গভীরভাবে জানতে হলে চিফ রাইটার হিসেবে আমদানীতে ও মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করা আবশ্যক।

তত্ত্বাবধায়ক প্রত্যেকদিন সামরিক কায়দায় বিউগল বাজিয়ে কারাভ্যন্তরে ঢুকেন। এটা রেওয়াজ, তবে জেল কোডে এ নিয়ম আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে অন্য কোন জেলে তত্ত্বাবধায়ক এভাবে ঢুকেন বলে কখনো শুনি নাই। খাগড়াছড়ি জেলেও দেখি নাই। তত্ত্বাবধায়কের এ হাস্যকার কান্ডকারখানায় তার অধঃস্তনরা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বদলি হলে সবার স্বস্তি লাগবে এটা অনুভব করেছি।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বন্দীরা জামিনে মুক্ত হয়। এ টাকা পায় বিচারক, উকিল, পিপি (পাবলিক প্রসিকিউটর), পেশকার, কেরাণী ও পুলিশ। বন্দী থাকার সময়ও দু'একটা সুবিধা পাওয়ার জন্য (এগুলো আসলে বন্দীর অধিকার) টাকা খরচ করতে হয়। গোসল, খাওয়া ও একটু ভালোভাবে থাকার জন্য টাকা দিতে হয়। বন্দীদের আত্মীয় স্বজনরা ঘরের ভিটা ও সহায় সম্পত্তি বেচে এ টাকার যোগান দেয়।

বলতে গেলে জেলে ঢুকলে একজন ভালো মানুষও খারাপ হয়ে যায়। একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে পশুতে পরিণত হয়। চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের চরিত্র পরিবর্তন করার জন্য শিক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা নেই জেলখানায়। ফলে জেল থেকে বের হওয়ার পর তারা আবার একই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। বহু বন্দী বছরের পর বছর জেলে কাটাচ্ছেন। এমনকি ৫৪ ধারায় গ্রেফতার হওয়া অনেককে বছরের পর বছর জেল খাটতে হয়েছে সে রকম নজিরও এদেশে অনেক আছে। তিন পার্বত্য জেলা বিশেষ করে দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবান জেলা থেকে অনেকে আছেন যারা প্রত্যেকে পাঁচ থেকে এগার বছর ধরে জেলে অন্তরীণ আছেন। সরকার তাদের মামলার নিষ্পত্তিও করে না, আবার জামিনও দেয়া না। তারা আইনের জটিল মারপ্যাঁচ বোঝে না এবং মামলা পরিচালনা করার মতো আর্থিক সামর্থ্যও নেই। এক শ্রেণীর অসৎ লোভী উকিলের ফাঁদে পড়েও অনেকে হয়রানির শিকার হন। যেমন আমাদের পার্টি কর্মি কাউখালি থানা ইউনিটের নেতা সুগত চাকমা, বিজয়-বসন্ত, মাটিরাঙ্গার পার্টি সমর্থক মানবেন্দ্র-এর আত্মীয় স্বজন কিছু স্বার্থবাজ উকিলের ফাঁদে পড়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু মামলার যেমন কোন অগ্রগতি হয় না, জামিনও মেলে না।

যারা মিথ্যা মামলা দেয় তাদের কোন শাস্তি হয় না। শাস্তির ব্যবস্থা থাকলে মানুষ বহু হয়রানি থেকে রেহাই পেতো। কোন একটি পরিবারের কোন এক সদস্য জেলে গেলে সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। টাকা দিলে তবেই কাজ হয়। টাকা দিয়ে এদেশে সবকিছু পাওয়া যায়, বিচারও নিজের পক্ষে নেয়া যায়। অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। বিচিত্র আমাদের এ দেশ!

যাদের জেলের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের কাছে আমার এই লেখাটি বিরক্তিকর মনে হবে। আমরা সাধারণত জানি যে চুরি, ডাকাতি, খুন, অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজে জড়িতদের পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। সত্যি বলতে কি কোন অপরাধ না করেও আমাদেরকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু কেন? এর এক কথায় ও সহজ উত্তর হলো জেএসএস-এর রাজনৈতিক মৃত্যুর পর যাতে ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে নতুন করে গণআন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্যই এই দমন পীড়ন। পৃথিবীর যেখানে নির্যাতিত গণমানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন হয়েছে সেখানে অনিবার্যভাবে নিষ্ঠুর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয়েছে সংগ্রামী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। উদাহরণের জন্য বেশী দূর যাওয়ার দরকার নেই। এই উপমহাদেশেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের যুগে কত বিপ্লবীকে যে কারাবরণ করতে হয়েছে, নির্বাসনে যেতে হয়েছে, পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। আর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান কি এদেশের গণমানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রক্তের জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেনি? ক্ষুদিরাম, মাস্টার দা সূর্য্যসেন, সুভাস বসু, প্রীতিলতা ও ইলা মিত্রেরা যুগে যুগে দেশে দেশে নিজেদের উত্তরাধিকার রেখে যায়। শাসক গোষ্ঠির নির্যাতন নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বারে বারে মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বেল করে তুলবে। শত নির্যাতন চালিয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করা যাবে না। *চলবে ....*

"পেন পিন্যা-উনরে ঠিগ গরগোই"

১ম পাতার পর

চেয়েছেন তারা হচ্ছে আসলে ভদ্রবেশী বদমায়েশ। এরাই জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ দেখলে বৃহত্তর স্বার্থকে পায়ে মাড়াতে এদের বিবেকে বাঁধে না। আর এদের জন্য নির্বাচন হলো এমন এক মৌসুম, যখন তারা স্বার্থ উদ্ধারের মোক্ষম সুযোগটি হাতের কাছে পায়। তারা এ সময় দেশ দরদী সমাজ হিতৈষী সেজে জনগণের সামনে দেখা দেয়। ভাব সাব এমন যেন তাদের কথা শুনলেই জনগণ রক্ষা পাবে। যেন তারাই রক্ষাকর্তা, ত্রাতা।

সামনে নির্বাচন আসন্ন। তাই এই ভদ্রবেশী বদমায়েশরাও (ভদ্রলোকরা নয়) তৎপর হয়েছে। এরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ধরনের কথা বার্তা ও দুই নাম্বারী তত্ত্ব প্রচার করছে। এদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে। বছরের পর বছর জনগণের ওপর যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে, ভূমি বেদখল হচ্ছে, মা-বোনের ইজ্জত হরণ করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এই ভদ্রবেশী বদমায়েশদের কখনোই সোচ্চার হতে দেখা যায়নি। এরা দিব্যি চাকুরী বাকুরী করেছে, ব্যবসাপাতি গুছিয়েছে, কিন্তু জনগণের পক্ষে একটি কাজও করেনি। অথচ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই তারা রাজনীতির মাঠে মুখ দেখাতে চাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিসে দৌঁড় ঝাপ দিচ্ছে। হঠাৎ করে জনদরদী সেজে তারা বলে বেড়াচ্ছে অমুক দল ভালো, অমুক দলকে ভোট দিতে হবে। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য এরা জনগণের মধ্যে পরাজয়বাদী আন্দোলন-পরিপন্থী তত্ত্বও হাজির করে। তাদের এই সব তত্ত্বের একটি হলো "বড় গাছের" নীচে আশ্রয় নিতে হবে, না নিলে জাতি ঠিকে থাকবে না। বড় গাছ বলতে এরা কোন দলকে বোঝাতে চায় তা এখানে না বললেও চলবে। তবে, তারা জানে না বা জানলেও লোকজনের কাছে বলে না যে, তাদের ঐ বড় গাছটি আসলে একটা মানুষ খেকো গাছ। কাজেই তাদের দেখিয়ে দেয়া গাছের নীচে আশ্রয় নেয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ অতীতে অন্তত পক্ষে দুই বার তাদের ঐ বড় গাছটির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তাতে ক্ষতিই হয়েছে। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভাগা জনগণের কোথাও আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে নিজের কাছে, নিজের শক্তির কাছেই আশ্রয় নিতে হবে। মহাপরিনির্বাণের সময় আনন্দের কাছে বুদ্ধের শেষ উপদেশটি ছিল "আত্ম দ্বীপো, আত্ম শরণো"। অর্থাৎ নিজের মুক্তির জন্য নিজের জ্ঞান প্রদীপ জ্বালাতে হবে এবং নিজের ওপরই নির্ভর করতে হবে। কেউ কাউকে মুক্তি দিতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকেও নিপীড়ন নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য নিজেদেরই চেষ্টা করতে হবে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি প্রত্যেকটি দলের সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। ভবিষ্যতেও চালাতে চাইবে। কিন্তু তারা যাতে নির্যাতন চালাতে না পারে তার জন্য দরকার নিজেদের শক্তিকেই বৃদ্ধি করা ও তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা। এতদিন একটি বিশেষ দলের নেতৃত্বের ভুল রাজনীতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের যে শক্তি আছে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় নি। এরা নিজের শক্তিকে নিজেদের মুক্তির জন্য ব্যবহার না করে জনগণের শত্রু-স্থানীয় একটি দলের কাছে তুলে দিয়েছে নিঃশর্তভাবে। সে কারণেই আজ জনগণের এই দশা। ভবিষ্যতে আমরা এটা আর হতে দিতে পারি না। চিরাচরিত কোন জাতীয় দল পাহাড়ি জনগণের বন্ধু নয়, এমনকি চূড়ান্ত বিচারে বাঙালী জনগণেরও বন্ধু নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে। এই দলগুলোর তাদের নিজস্ব শৃঙ্খলা আছে, নিজস্ব কর্মসূচী আছে, ও নিজস্ব স্বার্থ আছে। সে কারণে তাদের দল করে কিংবা তাদের দলের মনোনীত হয়ে সংসদ সদস্য পদ লাভ করলেও পার্বত্য জনগণের পক্ষে কোন কাজ করা যায় না। আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া যায় না। এটা বোঝার জন্য গভীর পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুটিকয় ভদ্রবেশী বদমায়েশ কথার মারপ্যাচে রাতকে দিন বানাতে চায়।

তবে আগামী নির্বাচনে এরা সুবিধা করতে পারবে না। কারণ জনগণ তাদের মতলব চিনে ফেলেছেন। জনগণ নিজেদের শক্তিকেও চিনেছেন। তারা এখন জানেন আন্দোলন করে, সংগ্রাম প্রতিরোধ করেই নির্যাতন ঠেকাতে হয়, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কোন জাতীয় দলের দালালী করে নয়। এই বোধ তাদের শক্তিকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কাজেই এবারের নির্বাচনে জনগণ এই ভদ্রবেশী বদমায়েশদের একটা উচিত শিক্ষা দেবেন - তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩ নং ঘাগড়া ইউপি উপনির্বাচনঃ কেন্দ্র ভিত্তিক অনিয়মের চিত্র

শেষ পাতার পর

ভোট দিতে আসার পথে লাঠিসোটা নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে ও আটকায়। অনেকে বাধা অতিক্রম করে ভোট দিতে আসতে চাইলে তাদেরকে জোর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। অনেককে মারধর করা হয়। ভোট কেন্দ্র থেকেও মারধর করে পাহাড়ি ভোটারদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। ২৩ জন পাহাড়ি ভোটার ভোট দিতে না পেরে কচুখালি ইউপি মেম্বার অংশিপ্রু চৌধুরীর কাছে আসেন এবং তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করে বিহিত ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানান। তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন যারা বিএনপি ক্যাডারদের শারীরিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন।

৩. কাশখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রঃ জসিম উদ্দীনের সমর্থকরা এই ভোট কেন্দ্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পুরো ভোট কেন্দ্র জোরপূর্বক দখলে রাখে এবং ইচ্ছেমত ভোট বাক্সে সিল মারা ব্যালট ঢুকিয়ে দেয়। সাধারণ ভোটাররা ভোট দিতে পারেনি। কাচখালি, ছোট নাভাঙ্গা পাড়া ও নাকশাছড়ির ভোটারদের পথে আটকানো হয়।

৪. জুনুমাছড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রঃ ভোট দিতে আসা ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়া হয়। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সমর্থকরা পাহাড়ি ভোটারদের আঙুলে কালি লাগিয়ে দিয়ে মাঝপথ থেকে তাড়িয়ে দেয়। সাধারণ ভোটাররা ভোট দিতে পারেননি। সারাদিন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার নামে কেন্দ্রটি কর্ডন করে রাখে।

৫. ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রঃ সকাল ১১টা থেকে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সমর্থকরা কেন্দ্রটি দখল করে নিয়ে নিজেরাই ভোট জালিয়াতি করে। এই কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারসহ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল সরকারী সংস্থার লোকজন রহস্যজনক কারণে ভোট জালিয়াতিতে কোন হস্তক্ষেপ করেননি।

৬. বগাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ এ কেন্দ্রে প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সমর্থকরা সাধারণ ভোটারদেরকে ভয়ভীত প্রদর্শন করে তাড়িয়ে দিয়ে সারাদিন কেন্দ্র দখলে রাখে এবং নিজেরা ইচ্ছেমত জাল ভোট দেয়। দুপুর ১২টার পর জসিম উদ্দীন খোকনের লেলিয়ে দেয়া মাস্তানরা ভোট কেন্দ্রে ঢুকে পোলিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে ইচ্ছামত সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়।

এছাড়া, ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী কলমপতি ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সেটলার সমর্থকরা দলে দলে এসে উপজেলা পরিষদ কেন্দ্র, কাশখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং বেতছড়ি মাদ্রাসা কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক জাল ভোট দেয়।

আহতদের কয়েকজন

প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় আহতদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে। ১. চিং হলাঅং মার্মা পিতা হ্লাপাঅং মার্মা, ২. সুই হ্লাঅং মার্মা পিতা রুই প্রুসি মার্মা, ৩. উসামং মার্মা পিতা সুইহ্লাঅং মার্মা, ৪. চিংমাহ্লা মার্মা পিতা থোয়াই প্রু মার্মা, ৫. সুই চিংউ মার্মা পিতা পাইসাঅং মার্মা, ৬. অংসুইনু মার্মা পিতা মংহ্লাঅং মার্মা, ৭. পাইউ মার্মা পিতা গংজ মার্মা, ৮. রেজিমং মার্মা পিতা মংকিউ মার্মা, ৯. চিং চাথোয়াই মার্মা পিতা রাজাচই মার্মা, ১০. পাইপ্রু মার্মা পিতা অজ্ঞাত।

এরা সবাই শামুকছড়ি গ্রামের বাসিন্দা এবং উপজেলা ভোট কেন্দ্রের ভোটার। এছাড়া বেতছড়ি গ্রামের বিমল চাকমা ও সুমন চাকমা নামে দুই জন ভোটারের নাম পাওয়া গেছে যারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

ঘিলাছড়ি ক্যাম্প কমান্ডারের

শেষ পাতার পর

জন্য তিনি তাদের পরামর্শ দেন। তিনি এই বলেও হুঁশিয়ার করে দেন যে, যদি কোন বাঙালী ব্যবসায়ী তার কথার বরখেলাপ করে তাহলে তার "খবর আছে"।

মহসিনের এই নির্দেশের পর থেকে বাঙালী ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত দামে পাহাড়িদের কাছ থেকে মালামাল কেনা বন্ধ করে দেন। পাহাড়িরাও অনেক দূর পথ হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে বিধায় পানির দরে তাদের মালামাল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। সেই পর থেকে এই অবস্থা এখনো চলছে।

মেজর মহসিনের পাহাড়ি বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক আচরণ যতই দিন যাচ্ছে ততই তীব্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রেও বৈষম্য সৃষ্টি করছেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য বাজারে শ্রদ্ধাদান সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু এবার তিনি কঠিন চীবর দান উপলক্ষে দান সংগ্রহ করতে গেলে তিনি তাতে তীব্রভাবে বাধা দেন। অপরদিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ব্যাপক হারে চাঁদা উত্তোলন করতে তিনি রীতিমত সহযোগিতা করে থাকেন।

ইব্রাহীম নামে এক বাঙালী ব্যবসায়ী ঘিলাছড়ি বাজারে ফোনের দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেন। তা থেকে আর্মিরাও রীতিমত ফোন করে থাকেন। কিন্তু বাজার কমিটির সভাপতি বিশ্বপ্রিয় চাকমা নামে এক পাহাড়ি যখন ফোনের দোকান খোলার উদ্যোগ নেন, তখন ক্যাম্পের এক লেফটেন্যান্ট তাকে ফোনের ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলে তিনি ফোনের ব্যবসার উদ্যোগ বন্ধ করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে ইব্রাহীম একচেটিয়াভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই সব পুচকি সেনা কমান্ডারদের দৌরাত্ম্য, দাপট ও মাস্তানীতে সাধারণ জনগণ এখন অসহায়।

সেনাবাহিনীর হুমকিতে কমলা রঞ্জন চাকমা ঘরছাড়া

মাহ্‌লছড়ি প্রতিনিধি॥

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সেনাবাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে মালছড়ির বাজার চৌধুরী কমলা রঞ্জন চাকমা ঘর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার কাহিনীর শুরু এভাবে। গত ৫ মার্চ ২০০৬ গভীর রাতে নিজ বাড়ি থেকে সেনা সদস্যরা তাকে আটক করে। সেনারা পরে তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে জেলে পাঠায়। দীর্ঘ ৬ মাস কারাভোগ করার পর গত ৫ আগষ্ট চট্টগ্রাম কারাগার থেকে তিনি জামিনে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে এক সপ্তাহের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন বা শ্রমণ হন। এর পর তিনি সংসার ও ব্যবসায়ে মনোবিবেশ করেন এবং বিজিতলা বাজারে নিজের দোকানে কাজ শুরু করে দেন। কিন্তু কমলা রঞ্জন চাকমার দুর্ভাগ্য! তার আর ব্যবসা করা হলো না। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার সকাল দশটায় বিজিতলা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর শহীদ বিজিতলা বাজারের দোকানদারদের ক্যাম্পে ডাকে। কমলা রঞ্জন চাকমাও অন্যান্য দোকানদারদের সাথে ক্যাম্পে যেতে বাধ্য হন। ক্যাম্প কমান্ডার মেজর শহীদ তাদের বলেন, "তোমাদের কেন ডেকেছি, জান?"। কারোর কাছ থেকে ইতিবাচক উত্তর না পেয়ে তিনি বলতে থাকেন: "আমার ক্যাম্পের সামনে কেন দোকান চুরি হয় ও ফায়ার করে?" মেজরের ভাষ্য মতে, ঐ দিন রাত ২ টার দিকে কমলা রঞ্জন চাকমার দোকানে গুলির শব্দ হয়। কিন্তু সকল দোকানদার বলেন তারা তা জানেন না কারণ তারা রাতে কেউ দোকানে থাকেন না। কিন্তু মেজর সাহেব ধমক দিয়ে বললেন, "কে ফায়ার করেছে তা তোমরা জানো"। তার পরদিন অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় পুনরায় ক্যাম্পে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়ার পর তিনি কমলা রঞ্জন চাকমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি এত বুকের পাটা কোথায় পেয়েছ, আমার সামনে ফায়ার করেছ?" সবাইকে ছেড়ে দিলেও মেজর বাহাদুর তাকে আরো এক ঘন্টা ক্যাম্পে আটকিয়ে রাখেন। তিনি পাহাড়িদের এলাকায় যে সব দোকান রয়েছে তা প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন এবং পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে যে ব্যক্তি গুলি ছুঁড়েছে তাকে ক্যাম্পে হাজির করার জন্য কমলা রঞ্জন চাকমাকে নির্দেশ দেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, "তাকে এনে দিতে না পারলে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব।"

কমলা রঞ্জন চাকমা মেজরের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। ফায়ারের শব্দও যেখানে মেজর শহীদ ছাড়া কেউ শোনেনি সেখানে, কে ফায়ার করেছে তিনি জানবেন কিভাবে! আর যদি জেনেও থাকেন তাহলে কিভাবে তাকে ক্যাম্পে হাজির করাবেন! তার তো আর ক্যাম্প কমান্ডারের মতো সৈন্যবাহিনী নেই! তিনি কি করবেন ভেবে কুল কিনারা না পেয়ে শেষ মেষ পালিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ পর দিন ক্যাম্পে গেলে নির্ঘাত শারীরিক নির্যাতন। তারপর হয়ত আবার জেল হাজতও হতে পারে!

কিন্তু কত দিন তিনি এভাবে পালিয়ে বেড়াবেন? ব্যবসা বাণিজ্য কাজ কর্ম ফেলে কত দিন মেজরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকবেন? ইতিমধ্যে তার পরিবার সর্বশান্ত হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর কতিপয় কমান্ডারের এ ধরনের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে কত নিরীহ লোকের জীবন সংসার যে শেষ হয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এর কোন প্রতিকার জনগণ পায় না। যার কাছে বিচার দেবেন তারাই নির্যাতনকারী। ফলে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের পথ বেঁচে নেয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না।

পানছড়ির সেলেসছড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে হত ১, আহত ১

নান্যাচর প্রতিনিধি॥

গত ২৪ আগষ্ট পানছড়ির সেলেসছড়িতে গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন নিহত ও অপর একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহতের নাম দেবরাজ চাকমা (২৬) পীং নলিনী কুমার চাকমা। তার বুকে তিনটি ও পেটে ১টি গুলি বিদ্ধ হয়। গুলিতে আহত ব্যক্তির পরিচয়ও পাওয়া গেছে। তার নাম মনি ভদ্র (৩০) পীং লক্ষী কান্ত চাকমা।

জানা যায়, ঘটনার দিন পানছড়ি সেলেসছড়ি গ্রামের ১০ - ১২ জন বন্য শুকর ধরার জন্য জঙ্গলে যায়। ফেরার সময় ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলে দেবরাজ মারা যায়। তার লাশ ২ দিন পর উদ্ধার করা হয়। আহত মনি ভদ্রকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসা শেষে তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ধারণা করা হয় গ্রামবাসীরা যে এলাকায় শুকর ধরতে যায় সেখানে সন্ত্রাসীদের একটি আস্তানা রয়েছে। ইতিপূর্বে ১০/১২ দিন আগে ঐ এলাকায় লোকজন বন্য শুকর ধরতে গেলে জঙ্গিরা ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। লোকজন যাতে জঙ্গিদের আস্তানার সন্ধান না পায় সে জন্য ভীতি সৃষ্টির জন্য গুলি ছোঁড়া হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

মাজলঙে সেনা তল্লাশী ও মারধরের শিকার গ্রামবাসী

সাজেক প্রতিনিধি॥

৯ সেপ্টেম্বর শনিবার গভীর রাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জোয়ানরা রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার মাজলং এলাকায় তিনটি বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছে ও ২ জনকে বেধড়ক মারধর করেছে।

খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের অধীন বাঘাইহাট জোনের নাগশ্বছড়ি (টাইগার টিলা) সেনা ক্যাম্প ও মন্দিরছড়া সেনা ক্যাম্পের ৩৩ বেঙ্গলের সেনা জোয়ানরা এ তল্লাশী অভিযান চালায়। এতে একজন মেজরের নেতৃত্বে ৪০ - ৫০ জন সেনা জোয়ান অংশ নেয়। সেনা দলের সাথে সামরিক ড্রেস (আর্মির পোশাক) পরা ২ জন জনসংহতি সমিতির সদস্য বা "দুই নাম্বারীও" ছিল। দুই জনের মধ্যে একজন নিজেকে "দুই নাম্বারী" বলেও পরিচয় দিয়েছে।

ঘটনার দিন গভীর রাতে (আনুমানিক রাত ১টা) সেনা জোয়ানরা এগজ্যাছড়ি গ্রামের টেগা চাকমার (৪০) বাড়ি ঘিরে ফেলে। তার বাড়িতে তল্লাশীর নামে জিনিসপত্র তছনছ ও এলোপাথারি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। তারপর সেনারা তাকে কোমরে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। মাজলং বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। সেনারা তার কাছ থেকে ইউপিডিএফ নেতাদের অবস্থান জানতে চায়। আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে ইউপিডিএফ-এর গণ ব্রিফিং কোথায় হয়েছে তার স্থানও সেনারা টেগা চাকমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে। সেনাদের ধারণা নির্বাচনী মিটিং যেখানে হয়েছে তার আশেপাশে ইউপিডিএফ নেতারা থাকবে এবং তাদেরকে ধরতে পারবে। সেজন্য সেনারা মিটিং-এর স্থান দেখিয়ে দেয়ার জন্য তাকে বেদম মারধর করে। সেনারা টেগা চাকমা ইউপিডিএফ-এর পক্ষে কাজ করে বলে অভিযোগ করে।

এরপর সেনা জোয়ানরা জেএসএস সদস্যদের নিয়ে ইউপিডিএফ সদস্য অজয় চাকমার বাড়ির উদ্দেশ্যে বাজার থেকে মিলন পাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সাথে তারা টেগা চাকমাকেও নিয়ে যায়। সেনারা অজয় চাকমার বাড়ি মনে করে মিলন পাড়ায় বৃদ্ধ প্রিয় চাকমা (৪০) পিতা মৃত দীন মোহন চাকমার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশী চালায়। জিনিসপত্র এলোপাথারি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। পরে যখন বুঝতে পারে তারা ভুল করে অন্য একটি বাড়িতে তল্লাশী করছে তখন সেনারা আবার টেগা চাকমার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়।

এরপর সেনারা অজয় চাকমার বাড়ির দিকে রওনা হয়। পথে ক'জন সেনা পিছলে পড়ে গেলে তার দোষ টেগা চাকমার ওপর চাপিয়ে সেনারা তার ওপর আবার শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে সেনারা অজয় চাকমার বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং তল্লাশী চালায়। সেনারা বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় ও অজয় চাকমাকে মারধর করতে থাকে।

সেনা সদস্যরা অজয় চাকমার কাছ থেকে ইউপিডিএফ-এর "বড় নেতাদের" অবস্থান বার বার জানতে চায় এবং ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত ইউপিডিএফ-এর মিটিং কোথায় হয়েছে তাও জানতে চায়। অজয় চাকমা ও টেগা চাকমাকে মারধর করেও ইউপিডিএফ নেতাদের অবস্থান ও মিটিংএর স্থান জানতে না পেরে মেজর ও সেনা জোয়ানরা জেএসএস সদস্যদের বকা দেয়। ভুল তথ্য দিয়ে জেএসএস সদস্যরা সেনাদের ও নিরীহ লোকজনদের কষ্ট দিচ্ছে বলে মেজর তাদেরকে বেশ গালমন্দ করে।

রাত দুইটার দিকে বড় রাস্তায় নিয়ে টেগা চাকমা ও অজয় চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সেনারা সামরিক পোষাক পরা জেএসএস সদস্যদের নিয়ে নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে যায়।

মাজলং এলাকায় সেনা নির্যাতনের কারণে লোকজনকে সব সময় ভয়ে দিন যাপন করতে হয়। ইতিপূর্বে ২০ বেঙ্গলের সেনা জোয়ানরা বহু নিরীহ লোকজনকে ধরে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলা সাজিয়ে জেলে পাঠিয়েছিল। এখনো তাদের মধ্যে অনেকে জেলে আটক রয়েছে। "সন্ত্রাসী" ধরতে পারলে সেনাদের প্রমোশনের জন্য সুবিধে হয়। সেজন্য অনেক সেনা কমান্ডার নিরীহ লোকজনকে ধরে তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে থাকে। এভাবে বহু নিরীহ লোকজন গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন। এলাকার জনগণের দাবি সেনাদের এ ধরনের চরম অমানবিক কাজ অচিরেই বন্ধ করা হোক।

বাঘাইহাটে সেনাদের গুলিতে ১ ব্যক্তি আহত

সাজেক প্রতিনিধি॥

গত ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১১টার সময় খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের অধীন বাঘাইহাট জোনের মন্দিরছড়া ক্যাম্পের (৩৩ বেঙ্গল) সেনাদের গুলিতে হাবারাম ত্রিপুরা (৩৫) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তাকে খাগড়াছড়িতে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গুলি করার পর মরে গেছে মনে করে সেনারা তাকে কাজলং নদীতে ফেলে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে সে বেঁচে যায় এবং মাজলং বাজারের পাশে জেলেদের ঢেংকী জালে আটকা পড়ে। জেলেরা তাকে চিনতে পেরে কাজলং-এর বালুচরে নিয়ে যায়। ঘটনা জানতে পেরে রাতে জেলেরা মাজলং বাজারস্থ পুলিশ ফাঁড়িতে যোগাযোগ করে। পুলিশের পরামর্শে জেলেরা আহত হাবারাম ত্রিপুরাকে বালুচড়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে দেয়।

অন্যদিকে পুলিশরা ঘটনা সম্পর্কে তাদের উর্ধতন কর্তপক্ষকে অবহিত করে এবং বাঘাইহাট জোনেও জানিয়ে দেয়। ঘটনা জানাজানি হবার পর ভোর রাতে বাঘাইহাট জোনের সেনারা গাড়ি যোগে মাজলং বাজারে যায় এবং হাবারাম ত্রিপুরাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

সত্য ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য সেনারা অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। তারা প্রচার করে যে, "হাবারাম ত্রিপুরার সাথে ১০ - ১৫ জন সশস্ত্র যুবক ছিল এবং তারা সবাই ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসী দলের সদস্য। হাবারাম ত্রিপুরা তাদেরকে সাথে নিয়ে ক্যাম্প আক্রমণ করতে গেছে। এতে সে আহত হয়েছে আর অন্যরা পালিয়ে গেছে।"

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, ঐদিন রাত আনুমানিক ৮টার দিকে হাবারাম ত্রিপুরা মন্দিরছড়া ক্যাম্পে যায়। সেখানে সে আবোল তাবোল বলে অসুখ চিকিৎসার জন্য পাহারারত সেনা জোয়ানদের কাছ থেকে ওষুধপত্র চেয়ে বসে। সেনারা তাকে পরদিন সকালে আসতে বলে। তবুও সে নাছোরবান্দার মত ক্যাম্প থেকে যেতে না চাইলে সেনারা জোর করে তাকে তাড়িয়ে দেয়।

এরপর সে আবার রাত ১১টার দিকে একই ক্যাম্পে যায়। তখন ক্যাম্পের গেইট অতিক্রম করার সময় সেন্ট্রীরত সেনারা তাকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেনারা স্থান চার্চ করে এবং তাকে দেখে চিনতে পারে। সেনারা তাকে মৃত ভেবে কাজলং নদীতে ফেলে দেয়।

কে এই হাবারাম ত্রিপুরা?

হাবারাম ত্রিপুরা রুলই পাড়ার স্থীয় বাসিন্দা। সে মানসিক ভারসাম্যহীন। ঘটনার বেশ কয়েক মাস আগে থেকে সে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতো। ঘটনার ক'দিন আগে সে রুলই পাড়ার বিডিআর ক্যাম্পে লংকা কান্ড ঘটিয়েছে। সে ক্যাম্পে ঢুকে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার দিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। এতে বিডিআর ক্যাম্পে জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হয়। ক্যাম্প কমান্ডার রুলই পাড়ার মুরুব্বীদের ডেকে পাঠান। মুরুব্বীদের কাছ থেকে তিনি হাবারাম ত্রিপুরা সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হন এবং তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে জোর করে ক্যাম্প থেকে বের করে দেন। তার ২/১ দিন পরই সে মন্দিরছড়া ক্যাম্পে গুলিবিদ্ধ হয়।

হাবরামের মানসিক ভারসাম্য হারানোর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে বলে জানা যায়। একদিকে সীমাহীন অভাব অনটন, বহু জনের কাছে প্রচুর পরিমাণ দেনা, সেই দেনা শোধ করতে না পারা, অন্যদিকে মদে আসক্তি ও পারিবারিক অভাব অনটন-অশান্তি তার মানসিক ভারসাম্য হারানোর জন্য দায়ি বলে এলাকার লোকজনের ধারণা। এসব ঘটনা সবই হাবারাম ত্রিপুরার স্ত্রী ও মৌজার হেডম্যান মাজলং পুলিশ ফাঁড়ির আইসি ও মন্দিরছড়া ক্যাম্পের মেজরকে জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেনারা ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার জন্য অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে।

"সুনেন্দু বিকাশ চাকমা কিভাবে চেয়ারম্যান হয় দেখে নেবো"

শেষ পাতার পর

জেতানোর জন্য কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালছে আর আমার সামনে বলছ কিছু করছে না। ইউপিডিএফ সুনেন্দুকে সমর্থন করছে এটা যদি স্বীকার না কর তাহলে তোমাদেরকে সাইজ করবো। তখন বুঝতে পারবা!" 'সাইজ' করে তিনি কংপ্রু ও দিবাকরকে থানায় ওসির কাছে হস্তান্তর করার পর কয়েকজন ব্যবসায়ীকে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা দেবেন বলেও হুমকি দেন।

অতপর তিনি এক সেপাইকে ডেকে হুকুক দেন বাজার থেকে কয়েকজন ব্যবসায়ীকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য। উক্ত সেপাই দশ মিনিট পর ৩/৪ জন বাঙালি ব্যবসায়ীকে নিয়ে ক্যাম্পে গোল ঘরে এসে হাজির হয়। তারা বসার সাথে সাথে ইয়াসিন বললেন, "আমি অনেক্ষণ পর্যন্ত দুই জন ইউপিডিএফ লোককে বসিয়ে রেখেছি। এরা সামনে ৩ নং ঘাগড়া ইউনিয়নে উপনির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে নির্বাচিত করার জন্য এলাকার লোকজনকে ধমক ও ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তুলে তার পেছনে খরচ করছে। আজ তাদের দু'জনকে ছেড়ে দেয়া যাবে না। আপনারা এসেছেন ভালো হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকে ওদের নামে চাঁদাবাজির মামলা করবেন। আর সুনেন্দু বিকাশ চাকমা কিভাবে চেয়ারম্যান হয় আমিও দেখে নেবো।"

থানা প্রশাসন ও আদালতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে বিজ্ঞের মতো ইয়াসিন বলেন, "আমি এটাও জানি থানায় পুলিশ ও আদালতে কিছু টাকা দিলে কয়েকদিন পর তোমাদের ছেড়ে দেবে। কারণ বাংলাদেশে আইন প্রশাসন ঠিক নেই, দুর্নীতিতে ভরা। তোমরা হয়ত কয়েকদিন পর বের হয়ে আসবে। কিন্তু যখনই বের হয়ে আসবে তখনই আবার ধরে আমি তোমাদের থানায় দেবো ও জেলে পাঠাবো।"

ইয়াসিন সাহেব দিবাকর ও কংপ্রুকে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে বিভিন্ন হুমকি দেন এবং বলেন, তিনি প্রয়োজনে ঘাগড়া থেকে অস্ত্রধারী জেএসএস সদস্যদের এনে পুরো কাউখালি বাজারের আশে পাশে বসিয়ে দেবেন, যাতে বাজারের ২/৩ কিলোমিটারের মধ্যে কোন ইউপিডিএফ সদস্য ঘেঁষতে না পারে। ইউপিডিএফ-কে এলাকার কোথাও থাকতে দেয়া হবে না বলেও তিনি দম্ভোক্তি করেন।

জনগণের প্রতিবাদ:

নির্বাচনে কারচুপি ও ভোটারদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে কাউখালির সর্বস্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তারা ভোট ডাকাতি ও হামলার সাথে জড়িত কাউখালি সেটলারদের গাছ ব্যবসায়ী সমিতির কাছে গাছ বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতিকার না পাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান। তিনি বলেন এমনিতেই এই গাছ ব্যবসায়ীদের হাতে সাধারণ গাছ বিক্রেতারা নানাভাভে প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। তার ওপর নির্বাচনে ভোট ডাকাতি যোগ হওয়ার জনগণের বিক্ষোভ আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর নিষ্ফল পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়া গত ১১ অক্টোবর এক দিনের সফরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমণ করেন। তিনি প্রথমে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি যান ও রীতি মাফিক কিছু "উন্নয়ন কর্মকান্ডের" ফিটা কাটার পর সমাবেশে বক্তব্য দেন। এর পর তিনি যথাক্রমে মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি ও দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবান যান।

তার সরকারের একেবারে শেষ মেয়াদে এসে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে পদধূলি দিলেন। ২০০১ সালে সরকার গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে এটাই তার প্রথম ও শেষ সফর। সমাবেশে তিনি তার সরকারের আমলে গৃহীত উন্নয়নের ফিরিস্তি দেন এবং বলেন, আগামীতে ক্ষমতায় আসলে পার্বত্যবাসীর সকল দাবি পূরণ করবেন।

কিন্তু পত্র পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে তার সফরের পর পার্বত্যবাসী হতাশ। কারণ তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার ঘোষণা দেন নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করা সর্বসাধারণের দাবি। এ ক্ষেত্রে সকল মহল ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু আপত্তি কেবল সেনাবাহিনীর। তাদের অনুমোদন না পাওয়ার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রাম যোগাযোগের সর্বাধুনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। আপত্তির জন্য সেনাবাহিনী যে যুক্তি দেখিয়েছে তা অত্যন্ত হাস্যকর ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের বালখিল্যতাই তাতে ফুটে উঠে। তবে কিছুদিন আগে সেনাবাহিনী তাদের আপত্তি তুলে নিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে জানা গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সেনাশাসন চলছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত বিষয়ে সেনাবাহিনীর মতামতই যে চূড়ান্ত সেটা প্রমাণ করতে মোবাইল নেটওয়ার্ক ইস্যুটিই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সমাবেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক চালুর ঘোষণা না দিয়ে প্রমাণ করলেন তার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবি দাওয়ার ব্যাপারে কত উদাসীন। তিনি মুখে উন্নয়নের খই ফোটালেন, পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার কথা বললেন, কিন্তু তিনি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু করার ব্যাপারে কোন কথা বললেন না। এই কর্কট স্ববিরোধীতা কথার ফুলঝুড়িতে ঢেকে ফেলা যায় না। আসলে তার এ সফর যে তাড়াহুড়ো করে অনেকটা সমালোচনা এড়ানোর জন্য করা হয়েছে তা বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে।

আমাদের জানা মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এটা খালেদা জিয়ার তৃতীয় সফর। তিনি খাগড়াছড়ি প্রথম সফর করেন ১৯৯২ সালে লোগাং গণহত্যার পর। সে সময়ও তিনি সরকার প্রধান ছিলেন। লোগাং গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদ ও নিন্দার ঝড়ের মুখে তিনি খাগড়াছড়ি সফর করতে বাধ্য হন। খাগড়াছড়ি হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত সমাবেশে তিনি বক্তব্য দেন। এ সময় লোগাং গণহত্যা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিলে উপস্থিত জনতা তাকে লক্ষ্য করে জুতা সেন্ডেল দেখায় ও প্রতিবাদে সমাবেশ থেকে ওয়াক আউট করে। সে সময় জনতার এই বলিষ্ট ও সাহসী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

দ্বিতীয় বার তিনি খাগড়াছড়ি আসেন ১৯৯৮ সালে। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে তার দল লং মার্চ এর আয়োজন করলে তিনি তার নেতৃত্ব দেন। লং মার্চ নামের তার গাড়ির কনভয়টি ঢাকা থেকে খাগড়াছড়ি গিয়ে শেষ হয়েছিল।

আগের দু'টি সফরের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হলেও, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সদ্য সমাপ্ত সফরের সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। যদি তিনি সমালোচনা এড়ানোর জন্য সফরটা হাতে নিয়ে থাকেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে বলতে হবে তার আশা সফল হয়নি। কারণ তার এই সফরের মাধ্যমে বিএনপির মধ্যেকার অনেক দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। খাগড়াছড়িতে তিনি ওয়াদুদ ভূইয়াকে আবার নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তার ভাষায় তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের ধারা বহাল থাকবে। কিন্তু ভূইয়া সাহেবের আমলে কি ধরনের উন্নয়ন হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে? বস্তুত তার উন্নয়ন কর্মকান্ডে লোকজন এত ত্যক্ত বিরক্ত যে সে সম্পর্কে এখানে বলা মানে হবে মা'র কাছে মামার বাড়ির গল্প বলার মতো। সে জন্য ভূইয়া সাহেবকে ভোট দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আকুতি জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ৩১ অক্টোবর ২০০৬ ■ বুলেটিন নং ৪১

অনিশ্চয়তার রাহুগ্রাসে বাংলাদেশ

১ম পাতার পর

দিনে ২৫ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন কয়েক হাজার। প্রাক্তন মন্ত্রী, এমপির ঘর-অফিস ও দলীয় কার্যালয়েও প্রচুর হামলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে তত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলেও ২৮ অক্টোবর থেকে চলা ১৪ দলীয় জোটের অবরোধ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার ঘোষণা ও মাঠ দখলে রাখতে উভয় পক্ষের চেষ্টা এই হামলার আশঙ্কাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রবল আপত্তি ও আন্দোলনের মুখে বিচারপতি কে. এম. হাসান তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর, রাষ্ট্রপতির নিজেই প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট কৌশলগত কারণে স্বাগত কিংবা প্রত্যাখ্যান কোনটাই না করে পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছে। কিন্তু যেহেতু লুটপাট ও সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে পুঞ্জিভূত সম্পদের পাহাড় রক্ষার জন্য বিএনপির নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন, এবং অপরদিকে, বিরোধী দলে থাকা মানেই প্রতিপক্ষের অত্যাচারে কর্মি-সমর্থকদের এলাকাছাড়া, ঘরছাড়া হতে বাধ্য হওয়া এবং মামলার ঝুলি কাঁধে নিয়ে থাকা, সেহেতু এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অন্য যে কোন সময়ের চাইতে তীব্রতর ও বহুগামী হতে বাধ্য। এমনকি একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনও দেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান দেবে কিনা সে নিয়ে যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়। কারণ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট শাসক গোষ্ঠিভুক্ত দলগুলোর শাসনতান্ত্রিক সংকট ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই অন্তর্বর্তীকালীন তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। উদ্দেশ্য: নির্দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান। সহজ কথায় বলতে গেলে, নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পারস্পরিক আস্থাহীনতার ফলে জন্ম নেয় তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। কিন্তু এক দশক যেতে না যেতেই এই ব্যবস্থাও বর্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও দুই দলের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রশ্নে আস্থাহীনতা আগের মতোই রয়েছে। বাংলাদেশের শাসক দলগুলোর নিজেদের সৃষ্ট এই সংকট থেকে উদ্ধারের কোন পথ খোলা নেই। এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের ঘূর্ণাবর্তে তারা এমনভাবে পতিত হয়েছে যা তাদের উভয়ের ধ্বংসই অনিবার্য করে তুলবে। এই পরিস্থিতিতে দেশকে বাঁচানোর জন্য দরকার প্রকৃত প্রগতিশীল শক্তিকে ছোট খাট মতপার্থক্য সত্বেও একই রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভুত হওয়া ও জনগণের মৌলিক ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে এসে আন্দোলন জোরদার করা। কারণ দুই জোটের কামড়া কামড়িতে দেশের জনগণ জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না।

ইউপিডিএফ গভীরভাবে দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করছে। ■

বড় মোনে জুম চাষ ও বন্য প্রাণী শিকার নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে

সচিব চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের মধ্যে এখনো প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের মূল উৎপাদন ব্যবস্থা হলো জুম চাষ। এ জুম চাষ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পাকিস্তান আমলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলের অধিবাসীরা জুম চাষ করে জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তখনকার সময় পাহাড়ি জমি ছিল খুবই উর্বর। বন জঙ্গল ছিল ঘন। পাহাড়গুলো ছিল গাছ, বাঁশ ছাড়াও "ভুলোঙ", "টিক্কা", "হিচ্ছ্যা", শন ও কলাবনে পরিপূর্ণ ছিল। জঙ্গলে ঢুকলে এক ধরনের নিস্তব্ধতা অনুভূত হতো। এই নিস্তব্ধতা ভেঙে কেবল শোনা যেতো বিভিন্ন পশু পাখির ডাক। তখন বনে হরেক রকমের পশু পক্ষীর বাস ছিল। গ্রামের পাশের বন জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, হরিণ, শুকর, বানর, গয়াল, সাপ ইত্যাদি আনাগোনা করতো। এক কথায়, তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল গভীর বনে ঢাকা ও নানা বিচিত্র প্রজাতির প্রাণীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু এখন আর তা নেই। ভ্যানিশিং এগ নামের যাদু খেলায় যাদুকরের হাতের ডিমগুলো যেভাবে চোখের পলক না পড়তেই উধাও হয়ে যায়, তেমনি হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে এই নিবিড় বিশাল বনরাজি। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

সে সময় জনসংখ্যা ছিল কম। জুমে ১০ - ১২ সের ধান বুনলে একটি একান্নবর্তী পরিবার অনায়াসে সারা বছরের খোরাক যোগাড় করতে পারতো। ধানের সাথে তিল, যব (চাকমা ভাষায় জেদেনা), শশা, লাউ, কুমড়া, হলুদ, আলু, কচু, মরিচ, বিভিন্ন ধরনের শাক সব্জি ও মসলা জাতীয় সুগন্ধী পাতার (যাকে চাকমারা ফুজি বলে) চাষ হতো এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। এখনো এসব চাষ হয়, কিন্তু জমির উর্বরতা কমে যাওয়ায় আগের মতো ফলন হয় না। জুম চাষ করে মানুষ এখন আর জীবন ধারণ করতে পারছে না। শুধুমাত্র বহু বছরের রীতি-অভ্যাস বশতঃ ও জীবিকার জন্য অন্য কোন পেশা না থাকায় জুম চাষ এখনো প্রচলিত রয়েছে।

জনসংহতি সমিতি যতদিন সশস্ত্র আন্দোলনে ছিল ততদিন বড়মোন বা কালো পাহাড়গুলোর বেশ কিছু অঞ্চল গভীর বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তারা তখন তাদের সামরিক প্রয়োজনে ও অন্যান্য কারণে বন রক্ষা করতো। কিন্তু চুক্তির পর কয়েক বছরের মধ্যেই এসব বন পুরো উজার হয়ে যায়। এক সময় জঙ্গলে ঢুকলে উপরে সূর্যের আলো ও আকাশ দেখা যেতো না। বৃষ্টির পানি সরাসরি মাটিতে পড়তো না। আর এখন এই সব পাহাড়ে মানুষ, গরু, ছাগল বেড়াতে দেখা যায়। বড় বড় গাছে ছাওয়া পাহাড়গুলো এখন ন্যাড়া অথবা লতা গুল্মে আচ্ছাদিত। মানুষের চেয়ে উঁচু ঝাঁড় জঙ্গল এখন আর দেখা যায় না বলেই চলে। বাণিজ্যিক কারণে অনিয়ন্ত্রিত গাছ কর্তন ও জুম চাষের কারণে শেষ হয়ে গেছে মহামূল্যবান বনজ সম্পদ। বন ধ্বংসের জন্য প্রধানত সরকারী নীতি ও মাইক্রো লেভেলে পাহাড়ি বাঙালি সবাই দায়ি।

পৃথিবীর অনেক দেশের ভৌগলিক মানচিত্র এবং জীব জন্তু, পশু পাখী ও বনজ সম্পদ দেখলে বুঝা যায় তারা কি পরিমাণ পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন। তারা পরিকল্পিতভাবে তাদের দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকে। কিন্তু আমরা কি করছি? ১৯৮৩ সালেও বাংলাদেশে ১৬ ভাগ বনভূমি ছিল। একটা দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে শতকরা ৩০ ভাগ বন থাকা দরকার। এখন বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ৮ ভাগের সামান্য বেশী হতে পারে। সমতলেই বরং এখন বড় বড় গাছ দেখতে পাওয়া যায়। অবিশ্বাস্য হলে সত হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও বড় বড় গাছ ও বাঁশ দেখা মেলে না। আগের মতো সবুজ সুন্দর বন নেই, এমন কি সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোও বৃক্ষ-শুন্য হয়ে যাচ্ছে। অসৎ, দুর্নীতিবাজ বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই মূলত এর জন্য দায়ি। তাছাড়া, জেএসএস ও সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যও বন ধ্বংসের জন্য দায় এড়াতে পারে না। চুক্তির আগে কাজলং ফকিরাছড়া রিজার্ভ ফরেস্ট ও চুক্তির পর বিলাইছড়ি-রেইংক্ষ্যং-ফাড়ুয়া রিজার্ভ ফরেস্ট উপরোক্ত তিন পক্ষ ধ্বংস করে ফেলেছে। শুধু তারাই নন, যারা জীবিকার তাগিদে এখনো জুম চাষ করতে বাধ্য হন, তারাও বন ধ্বংসের জন্য কম দায়ি নন। এছাড়া, কাজলং রিজার্ভের উত্তর অঞ্চল নাড়েইছড়ি-মিইনী নদীর উৎপত্তি স্থলের দিকে প্রতি বছর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে লোকজন গোপনে ঢুকে জুম চাষে প্রবৃত্ত হয়।

অবিশ্বাস্য হলে সত হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও বড় বড় গাছ ও বাঁশ দেখা মেলে না। আগের মতো সবুজ সুন্দর বন নেই, এমন কি সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলোও বৃক্ষ-শুন্য হয়ে যাচ্ছে। অসৎ, দুর্নীতিবাজ বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই মূলত এর জন্য দায়ি। তাছাড়া, জেএসএস ও সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যও বন ধ্বংসের জন্য দায় এড়াতে পারে না।

এভাবে অবাধে ও বিরামহীনভাবে বন উজার হয়ে যাওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ইতিমধ্যে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। গিরি, ঝরণা, নদ-নদী ও ছড়া-ছড়িতে পানি শুকিয়ে গেছে। বনের পরিমাণ কমার ফলে আগের মতো বৃষ্টি হয় না। অপরদিকে, বৃষ্টি হলে মাটির উপরিভাগ ক্ষয় হচ্ছে। এতে জমির উর্বরতা কমছে, আর নদী বিধৌত মৃত্তিকায় কাপ্তাই হ্রদ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। জুমেও ফলন হচ্ছে না। বন না থাকায় নানা প্রজাতির বন্য প্রাণীও হয় ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে, নতুবা বিলুপ্ত হতে বসেছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন নানা ধরনের পাখির মধুর ডাক শুনে মন ভরে উঠতো। বড় বড় পাখি যেমন শকুন, মল্লা, কেইট-কেইট্যা, ডুডুহাং, চিল, শিগিরা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ঘুঘু, ময়না, শের, টুনটুনি (সুদোত্তুবি), আড়িছড়ি ইত্যাদি পাখি এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী যেমন গুইসাপ, কচ্ছপ এখন খুব কমই দেখা যায়। হরিণ, ভালুক, হুদুক (সজারু) বিলুপ্তির পথে। (এখানে কতগুলো নাম চাকমা ভাষায়, বাংলায় কি বলে সে সম্পর্কে ধারণা নেই)। এদের রক্ষা করা আমাদের এখন জরুরী কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং দেরী না করে পরিবেশ রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের বন আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে। মা যেমন তার সন্তানকে লালন পালন করেন, ঠিক সেভাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের বনরাজি রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এ জন্য প্রত্যেক পার্টি সদস্যকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও বন্য প্রাণী শিকার বন্ধ করার পার্টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন আগামীতে আরো বেশী কঠোর ও আন্তরিক হতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) জন্ম লগ্ন থেকে পরিবেশ রক্ষায় সাধ্য মতো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গণ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পার্টির বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা চালানো হয়। বিভিন্ন গণ মিটিঙে জনগণকে বন রক্ষা ও বন্য প্রাণী শিকার না করার জন্য অনুরোধ করা হয়ে থাকে। জুম চাষের ব্যাপারে পার্টির কর্মসূচী আগেই বলা হয়েছে। মোট কথা, পরিবেশ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা পার্টির পক্ষ থেকে চালানো হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে এ প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা হবে।

শেষ করার আগে বন ও পরিবেশ রক্ষায় কয়েকটি সুপারিশ করতে চাই। আশাকরি সাধারণ জনগণসহ সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ এগুলো বিবেচনা করবেন। এগুলো হলো, ১. যে কোন উপায়ে বড়মোন বা কালো পাহাড়ে জুম চাষ বন্ধ করা। জুমচাষীরা নিতান্ত প্রয়োজনে গ্রামের আশে পাশে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে জুম চাষ করবেন। ২. কালো পাহাড়ে যারা দীর্ঘ কয়েক বছর বা কয়েক যুগ ধরে বসতি করে অবস্থান করছেন ও জুমের উপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ৩. ইটের ভাটায় লাকড়ির ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা। কাউখালি, লক্ষ্মীছড়ি, মানিকছড়িসহ অন্যান্য এলাকায় শীত মৌসুমে লাকড়ি টানার গাড়ির অনুমোদন না দেয়া। ৪. বন্য প্রাণী ও পশুপাখি নিধন বন্ধের জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো ও আইন লঙ্ঘনকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা। ৫. বন এলাকায় যত্র তত্র আগুন না লাগানো এবং অপ্রয়োজনে কোন গাছ বা বাঁশ না কাটা। ■

কারা জীবনের কিছু কথা

■ সচিব চাকমা ■

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যারা গরীব নিরীহ পাবলিক তারা আরো বেশী কষ্টে আছেন জেল হাজতে। কারণ জেলে বা কোর্টে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করার মতো লোক নেই। এমনও অনেক আছেন যারা জেলে আসার পর থেকে তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে পারছেন না। তাদের আত্মীয় স্বজনরাও জানেন না কোথায় কিভাবে দেখা করতে হবে। আর্থিক সংকটের কারণেও অনেকের আত্মীয় স্বজন দেখা সাক্ষাত করতে পারেন না। রুমা, থানচি, বাঘাইহাট, সাজেক থেকে যারা জেল হাজতে আছেন, তাদের বাবা মা, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনরা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম কোথায় জানেন না। কিভাবে যেতে হয় তাও জানেন না। এমন বন্দীও আছেন আত্মীয় স্বজনের সাথে যাদের ১০ -১২ বছর ধরে দেখা সাক্ষাৎ নেই। সব চেয়ে আমার খারাপ লেগেছে যখন সহ-বন্দীদের কাছ থেকে শুনেছি কিভাবে সেনাবাহিনী বিভিন্ন থানা থেকে তাদেরকে রাস্তাঘাট কিংবা নিজ বাড়ি থেকে কিংবা মাঠে-ক্ষেতে-খামারে কাজ করা অবস্থায় ধরে এনে মিথ্যাভাবে অস্ত্র মামলা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। এভাবে আটক হয়ে ৪ জন নিরীহ ত্রিপুরা জাতির লোক খাগড়াছড়ি জেলে এখনো অন্তরীণ আছেন। তাদের মধ্যে কেবল একজনের নাম মনে আছে। তার নাম হচ্ছে শান্তি কুমার ত্রিপুরা। তাদের সাথে কথা বলে যা জানতে পেরেছি তা হলো এই - সেনাবাহিনী তাদেরকে গাদা বন্দুক ব্যবহারের লাইসেন্স দেয়। পরে সেনাবাহিনীই সেই গাদা বন্দুকগুলো জব্দ করে এবং এগুলোসহ তাদেরকে থানায় সোপর্দ করে। তাদের বিরুদ্ধে "বেআইনী অস্ত্র" রাখার দায়ে মামলা করা হয়েছে। মালছড়ির মাচ্যছড়া বদানালা থেকে সজীব কুমার ও তার সঙ্গীকেও সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে এসে জেলে প্রেরণ করে। তাদের বিরুদ্ধেও একই ধরনের মামলা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে জিরো মাইল থেকে শাকিল ত্রিপুরা, চম্পাঘাট থেকে দু'জন পাহাড়ি এবং মাচ্যছড়া বাজার থেকে কালাচান ও রিপন চাকমাকে ধরে মিথ্যা অস্ত্র মামলায় জেলে পাঠানো হয়েছে। এ ধরনের অপকর্ম তুলনামূলকভাবে মালছড়ি জোন এবং গুইমারা ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন জোন ও সাবজোনে কর্মরত সেনারা বেশী করে থাকে বলে আমার মনে হয়। নিরীহ লোককে সন্ত্রাসী সাজানোর সেনা বদমায়েশী এতদূর গড়িয়েছে যে, গত কয়েক মাস আগে কতিপয় সেনা সদস্য বিজিতলার জনৈক পাহাড়িকে খাগড়াছড়ির কগনিজেন্স আদালত থেকে বের করে কোর্টের বারান্দায় নিয়ে এসে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তুলে। বিষয়টি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো ভালো বলতে পারবেন।

খাগড়াছড়ি জেলখানায় পানির সমস্যা খুবই প্রকট। সপ্তাহে দু'তিন বার গোসল করানো হয় মাত্র। গোসলের সময় পানি দেয়া হয় মাত্র দু'তিন থালা। এর চেয়ে বেশী পানি চাইলে জমাদার, মিঞাসাব ও পানির মেটের অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ শুনতে হয়। এর প্রতিবাদ করলে পটাপট পিঠের উপর কিল ঘুষি অবধারিত। কিন্তু "সিস্টেম" করলে খাওয়া, চিকিৎসা, গোসল, হাঁটাহাঁটি সবকিছুতে সুবিধা পাওয়া যায়। জেলখানার চিকিৎসা হলো প্যারাসিটামল ও ওপেন ট্যাবলেট ছাড়া অন্য কোন ওষধ নেই। শরীরে যা কিছু হোক - জ্বর, ব্যথা, ফোঁড়া- তার জন্য ঐ দুটো ট্যাবলেটই নির্ধারিত। অর্থাৎ সর্বরোগের অসুখে এ দু'টো ট্যাবলেটই দেয়া হয়। জেলখানায় তিন বেলা খাবার দেয়া হয়। সকালে রুটি একটি; সাথে গুঁড় অথবা ডাল। দুপুরে রুটি দু'টি, সাথে ডাল-তরকারী এবং রাতে ভাত, সাথে ডাল, সবজী ও মাছ অথবা মাংস অথবা ডিম। এ সব খাদ্যের মান অত্যন্ত নিম্ন। একে ত পরিমাণে কম দেয়া হয়, তার উপর অপরিস্কার রান্না। তত্ত্বাবধায়ক বা জেলারকে খাদ্যের যে স্যাম্পল দেখানো হয়, প্রকৃতপক্ষে বন্দীদের সেভাবে দেয়া হয় না। এ বিষয়টি তিনি হয় জানেন না, নতুবা জেনেও না জানার ভান করেন। কারণ প্রশাসন আসামীদের শাস্তি দিতে জানে, কিন্তু তাদের সমস্যা, অভিযোগ, দাবি-দাওয়া শুনার জন্য প্রস্তুত নয়। কোন বিষয়ে আপত্তি করলে একটা কথা শুনিয়ে দেয়া হয়: "জেলখানায় চোর চোরের মতো থাকতে হবে।" তবে শক্তের ভক্ত, নরমের যম বলে একটা কথা আছে। জেলখানায় তার প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, খাগড়াছড়ি জেলখানায় জিতেন বড়ুয়া নামে এক দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টারকে জেলে ঢোকানো হয়। তিনি সপ্তাহ খানেক ছিলেন। দেখা গেল তাকে যেন জেলে জামাই আদরই করা হয়েছিল। "সিস্টেম তো দূরের কথা, উল্টো প্রশসান তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। জেলে দাপটের সাথে চলতে চাইলে ক্ষমতা, অর্থ এবং সেয়ানাগিরি বা বিক্লাশ - এ তিনটি "যোগ্যতা বা গুণ থাকতে হয়। অন্যথায় হেলাফেলা অবস্থায় পড়ে থাকতে হয়।

উন্নত বিশ্বে জন্তু জানোয়ার ও পশু পক্ষীদের আদর যত্ন ও সেবা দেয়া হয়। কিন্তু জেলখানায় মানুষকে পশুর চেয়ে অধম করে রাখা হয়েছে। কোন সুযোগ সুবিধার কথা তুললে বলা হয় জেল আইনে নেই। জেলখানায় কোন পরিদর্শক গেলে আসামীদের আগেভাগে বলে দেয়া হয় পরিদর্শকের কাছে কোন প্রকার নালিশ কিংবা অভিযোগ করা যাবে না। অমান্য করলে শাস্তি দেয়া হয়। যেমন খাগড়াছড়ি সদর থেকে আব্বাস নামে এক বন্দী ডিসি সাহেবের কাছে তার সমস্যার কথা বলায় তাকে মারধর করা হয়। আসলে জেলখানায় নির্যাতনের কথা বলে শেষ করা যাবে না। তারপরও লিখতে যখন বসেছি এ বিষয়ে কিছু না বললে পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হবে। প্রতি সপ্তাহে একবার ওয়ার্ড চেক করা হয়। মনে করা হয় বন্দীরা বিরাট কিছু লুকিয়ে রাখে। যা কিছু রাখা হয় তা বাহির থেকে ঢোকানো। সেগুলো সিস্টেম করে অর্থাৎ জায়গা মত ঘুষ দিয়ে ঢোকানো হয়। এভাবে হিরোইন, গাজা, ফেনসিডিল ইত্যাদি অবৈধ মাদক দ্রব্যও নির্বিঘ্নে ঢুকে যায়। এগুলো জেলে তো বটে জেলের বাইরেও একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু মাদকাসক্তরা অসৎ দুর্নীতিবাজ জমাদার ও মিঞাসাবদের মাধ্যমে সেগুলো ঢুকিয়ে থাকে। মিঞাসাবরা জেলখানায় একটা আকিজ বিড়ির বিনিময়ে অবৈধ জিনিস ঢোকানোর অনুমোদন দেয় ও অবৈধ কাজ করতে দেয়। "সিস্টেম" করলে যে জীবন্ত গরু, ছাগল, মুরগী ঢোকানো যাবে না তা বলা যাবে না। কারণ সিস্টেম করলে বাইরে রান্না করা মাছ মাংস ঢোকানো যায়। প্রতি সপ্তাহে যে ওয়ার্ড তল্লাশী অভিযান পরিচালনা করা হয়, তা যেন অনেকটা খেলা বলেই মনে হয়। কারণ ওয়ার্ডে কি করা হয় তা কর্তব্যরত মিঞাসাব, জমাদাররা খুব ভালো করেই জানে, দেখে এবং অনেক সময় তারা নিজেরাই উৎসাহ দেয়। জেলখানা (বিশেষ করে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার) হচ্ছে হিরোইনসেবীদের আড্ডাখানা। তবে খাগড়াছড়ি জেলে এটা আমার চোখে পড়েনি। জুয়া খেলা চলে মিঞাসাবদেরকে দৈনিক ১০ টাকা ঘুষ দিয়ে। কোর্টে আনা নেয়ার সময় আসামীদের তল্লাশীর নামে অযৌক্তিকভাবে ও মাত্রাতিরিক্ত হয়রানি করা হয়। কোর্টে নিয়ে যাওয়ার সময় একজন আসামীকে চার বার চেক করা হয়। গোপনাঙ্গ, মলদ্বার থেকে শুরু করে শরীরের কোন অংশই বাদ পড়ে না যা মিঞাসাবরা স্পর্শ করে না। এত কড়া (!) চেক, কিন্তু তবুও কিভাবে হিরোইন গাজা ঢোকে? আমি এক বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি উচ্চতর এক বা একাধিক কর্মকর্তার মাধ্যমে হিরোইন ঢোকানো হয়। বিশেষ করে শিবির ন্যাসিরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হিরোইন দেয়া হয় বলে শুনেছি। একসাথে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত ঢোকানো হয় বলে এক অভিজ্ঞ আসামীর কাছ থেকে শুনেছি।

তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক বজলুর রশীদ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন জেলখানার দুর্নীতি অনিয়ম রোধ করতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি একা ও অসহায়। মিঞাসাব, জমাদাররা যেভাবে তাঁকে গালি গালাজ করতে শুনেছি তাতে তার বিরুদ্ধে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চললেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে তত্ত্বাবধায়ক যদি খাদ্য বিষয়ে ও ডাক্তার উদয় শংকর চাকমা যদি বন্দীদের চিকিৎসা বিষয়ে আরও সৎ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন, তাহলে কারাগারের অবস্থা কিছুটা হলেও উন্নত হবে এবং তা বন্দীদের প্রশংসা অর্জন করবে নিঃসন্দেহে। তত্ত্বাবধায়কের জানা উচিত তাকে যেভাবে রুটি, ডাল, মাছ, মাংস, সবজীর স্যাম্পল দেখানো হয়, সেভাবে বন্দীদের দেয়া হয় না। বন্দীদের মুখে ডাক্তার উদয় শংকর চাকমাকে প্রশংসা করতে শুনেছি। তাকে বন্দীরা চাকমা সাব বা চাকমা স্যার বলে সম্বোধন করে থাকে। আমার মনে হয় চিকিৎসা বিষয়ে ভবনের আসামীদের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেয়া উচিত। কারণ বলা যায় তারা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত থাকেন। ওয়ার্ডে হঠাৎ কারো অসুখ হলে বা জরুরী শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে মেডিকেলে যেতে পারে না, ডাক্তার পাওয়া যায় না, ওষধ পাওয়া যায় না। চট্টগ্রাম কারাগারে সার্বিকভাবে পানির সমস্যা কিছুটা লাঘব হলেও থাকা খাওয়ার সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। খাওয়ার পানির সংকট অত্যন্ত তীব্র। যারা ভবনে থাকেন তাদের কোর্টে যাওয়ার জন্য একদিন আগে "আমদানী ওয়ার্ডে" আসতে হয়। ১০ টাকা দিলে ঐ হয়রানি থেকে বাঁচা যায়। অর্থাৎ "আমদানী ওয়ার্ডে" আসতে হয় না। কোর্ট থেকে ফিরতে দেরী হলে রাতে আবার আমদানী ওয়ার্ডে থাকতে হয়। কোর্টে যাদের আত্মীয় স্বজন দেখা করতে আসে না তাদেরকে সারাদিন না খেয়ে থাকতে হয়। তারপর দেরীতে জেলখানায় ফিরে এসেও খাবার পান না ঠিকমত। বন্দীদের কষ্ট লাঘব করার জন্য এ বিষয়টি জেল কর্তপক্ষের দরদ দিয়ে দেখা দরকার।

আর একটা ব্যাপার হলো তত্ত্বাবধায়ককে না জানিয়ে ভবনের আসামীদের ওয়ার্ড চেঞ্জ করা হয়। এ কাজ করে জমাদার ও সুবাদার মিলে। তবে এর আসল হোতা হলো ওয়ার্ডের মেট এবং পাহারাদার। টাকা না দিলে সিট পাওয়া যায় না ঘুমানোর জন্য। এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করলেও সহজে জানা যাবে না। কারণ তারা সংঘবদ্ধ চক্রের নিকট জিম্মি। বললে রাতে উত্তম মধ্যম পেতে হয়।

জেলখানার দুনিয়াটা যেন উল্টো। মেডিকেলে দেখেছি, যারা সুস্থ তারা চৌকির উপরে, আর যারা রোগী অসুস্থ তারা চৌকির নীচে ঘুমায়। রোগী হিসেবে সুস্থ বন্দীরা ভর্তি হয় এককালীন ৫,০০০ টাকা এবং প্রতি মাসে ৫০০ টাকা ঘুষের বিনিময়ে। এই টাকা মেট, রাইটার ও ডাক্তাররা পকেটস্থ করে বলে শুনেছি। রোগীর নামে যে সব ডায়েট ও ঔষধ বরাদ্দ হয় সেগুলো অপব্যবহার হয়। যাদের জন্য ডায়েট বরাদ্দ হয় তারা তা পান না। ঔষধ বাইরে বিক্রি করা হয়। দুর্নীতি অনিয়ম মাস্তানী দাপট কি জিনিস তা জেলখানায় আসার আগে বুঝতে পারি নি। খাগড়াছড়ি জেলে আমাকে তিন দিন আওলাবেরী টানতে হয়েছে সামান্য একটা কারণে। কারণটা হলো এই, মাটিরাঙ্গা থেকে হত দরিদ্র চার জন নিরীহ পাহাড়িকে সেনাবাহিনী অস্ত্র মামলায়

২য় পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার

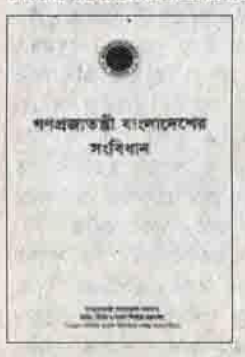

প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান থাকে। এতে সাধারণত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা, তাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক, সরকার পদ্ধতি, রাষ্ট্রের চরিত্র, রাষ্ট্র পরিচলনার মূলনীতি ইত্যাদি বিষয়ে লেখা থাকে। এছাড়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী নাগরিকগণ কি কি অধিকার ভোগ করবেন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যই বা কি সে সম্পর্কেও সংবিধানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর এবং বলবৎ হয় একই বছর ১৬ ডিসেম্বর। আজ পযন্ত সংবিধানে ১৪ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৪ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিষয়ে ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়স সীমা বাড়িয়ে চতুর্দশ সংশোধনী আনা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানে কতিপয় মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেক নাগরিক ভোগ করার অধিকারী। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ থেকে ৪৭ ধারায় এই অধিকার বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার প্রায় সবকটি উল্লেখ করা হলো:

ধারা ২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। **ধারা ২৮:** কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না। **ধারা ২৯:** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। **ধারা ৩২:** আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না। **ধারা ৩৩ (১):** গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। **ধারা ৩৩ (২):** গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। **ধারা ৩৪:** সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। **ধারা ৩৬:** জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। **ধারা ৩৭:** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। **ধারা ৩৮:** জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। **ধারা ৩৯ (১):** চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। **ধারা ৪০:** আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। **ধারা ৪১ (১):** আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। **ধারা ৪১(২):** কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না। **ধারা ৪৩:** রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের (ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

দিঘীনালার বাবুছড়ায় ইউপিডিএফ কর্তৃক নির্মিত বাঁশের ব্রিজ

জনগণের সুবিধার্থে সেতু নির্মাণ

স্বাধিকার রিপোর্ট

ইউপিডিএফ দিঘীনালা ইউনিটের উদ্যোগে বাবুছড়া মগ্যা কার্বারী পাড়ায় জনগণের চলাচলের সুবিধার্থে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

বাবুছড়ার বাঘাইছড়ি নদীর তীরবর্তী এলাকায় ২০ - ২৫ পরিবারের বসবাস। এই এলাকার লোকজন যোগাযোগের অসুবিধার কারণে দীর্ঘ দিন ধরে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে আসছিলেন। এলাকাটি একদিকে বাবুছড়া-দিঘীনালা ইউপি ও অন্যদিকে বাঘাইছড়ি-দিঘীনালা মৌজার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় কোন পক্ষই এই এলাকার জনগণের যাতায়াত সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে না। বর্ষাকালে সবচেয়ে বেশী কষ্ট ভোগ করতে হয় মগ্যা কার্বারীর অধিবাসীদের। এই গ্রামের লোকজনকে অন্য এলাকার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় একটি মাত্র রাস্তা দিয়ে। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে একটি খাল থাকায় চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে এই খালটি পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়। ফলে লোকজনের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। স্কুল কলেজ ও হাট বাজারে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। জনগণের এই অবস্থা বিবেচনা করে ইউপিডিএফ দিঘীনালা ইউনিট সেখানে একটি বাঁশের সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়।

দিঘীনালায় ইউপিডিএফ-এর সংগঠক সানি চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ কর্মিরা গত জুলাই মাসে (?) টানা দুই দিন পরিশ্রম করে সেতুটি নির্মাণ করেন। এর ফলে এলাকার জনগণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে। ইউপিডিএফ এর ধরনের জনহিতকর উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

দিঘীনালার বাবুছড়ায় পাঁচ দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযান

স্বাধিকার রিপোর্ট

ইউপিডিএফ দিঘীনালা ইউনিটের উদ্যোগে ৩১ জুলাই থেকে ৪ আগষ্ট পর্যন্ত পাঁচ দিন ব্যাপী বাবুছড়ায় বৃক্ষরোপন অভিযান পরিচালিত হয়েছে। ৩১ জুলাই সকাল ৯টায় নোয়াপাড়াস্থ বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভার মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপন অভিযান শুরু হয়। সাবেক বাবুছড়া বাজার চৌধুরী জিতেন্দ্রীয় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজসেবক সুগত চাকমা, ইউপি সদস্য গোপাদেবী চাকমা, শিক্ষক তিমির বরণ চাকমা, পূর্তা কুমার চাকমা, ইউপিডিএফ-এর অতুল চাকমা, সানি চাকমা ও অনিমেষ চাকমা। সভা পরিচালনা করেন সমশান্তি চাকমা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষায় বনের ভূমিকা অপরিসীম। একটি দেশে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ১৭.৮ শতাংশ। অনিয়ন্ত্রিত বন নিধনের ফলে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে এই বনভূমির পরিমাণ কমেছে। এটা দেশের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক।

বৃক্ষের চারা রোপন করছেন ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামেও ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন চলছে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই গাছ কাটা হচ্ছে। ফলে বনভূমি উজার হয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও যে পাহাড়গুলো সবুজ গাছ গাছালিতে পরিপূর্ণ ছিল সেগুলো আজ ধূসর বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। পাহাড়গুলো বৃক্ষশুন্য হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য। বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির পশু পক্ষী। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

বক্তারা বলেন, আপামর জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

আলোচনা শেষে বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং বেনুবন বৌদ্ধ বিহারের প্রবেশ পথে দুটি কৃষ্ণচূড়া চারা রোপনের মাধ্যমে ৫ দিন ব্যাপী বৃক্ষ রোপন অভিযান শুরু হয়। এলাকার মুরুব্বী এবং ছাত্র সমাজকে সম্পৃক্ত করে বাঘাইছড়ি দোর ব্রিজ থেকে বাবুছড়া দোর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে কৃষ্ণাচূড়া, মেহগনি, শিশু, কড়ই, অর্জুন প্রভৃতি গাছের চারা রোপন করা হয়।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসন কামনা করে দিঘীনালায় গণ প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসন হোক এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে দিঘীনালার সর্বস্তরের জনসাধারণের উদ্যোগে ১০ অক্টোবর এক গণ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রার্থনা সভায় এলাকায় চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি, যুব সমাজের মধ্যে মদ-গাজা-হিরোইন ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানের আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয় সমাজে যে হারে চুরি ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যুব সমাজের মধ্যে নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যেভাবে জেএসএস-ইউপিডিএফ-এর মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত লেগে আছে, তাতে করে জাতীয় উন্নতি বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা মনে করেন সবার সম্মিলিত শক্তি ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ব্যতীত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। জাতির এই দুরাবস্থা দেখে কোন সচেতন ব্যক্তি নির্বিকার থাকতে পারে না।

গণপ্রার্থনার মাধ্যমে আয়োজকরা বুঝাতে চেয়েছেন এ এলাকার জনগণ শান্তি চান, অবস্থার উন্নতি চান। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চান।

অনুষ্ঠানটি সকাল ও বিকাল দুটি সেশনে ভাগ করা হয়। এতে আমন্ত্রিত ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে সংঘদান ও অষ্ট পরিস্কার দান করা হয়। উপস্থিত ভিক্ষু সংঘ সে সমস্ত দান অনুমোদন করেন ও সমবেত জনতার প্রার্থনা বাস্তবায়নের জন্য আশির্বাদ করেন। প্রার্থনা সভায় ধর্ম দেশনা প্রদান করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি, শ্রীমৎ শ্রদ্ধালংকার, শ্রীমৎ তেজ বংশ ও শ্রীমৎ বুদ্ধ বংশ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান পুষ্প কান্তি চাকমা, বাবুছড়া ইউপি'র বর্তমান চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা, দিঘীনালা ইউপি'র বর্তমান চেয়ারম্যান চন্দ্র রঞ্জন চাকমা, এলাকার মুরুব্বী জ্যোতির্ময় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা, ইউপিডিএফ নেতা শান্তি দেব চাকমা ও অনিমেষ চাকমা।

প্রার্থনা সভায় পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ ও বন ভিক্ষু সংঘ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৭ সেপ্টেম্বর মহান শিক্ষা দিবসে

শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে পিসিপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ঢাকা শাখার উদ্যোগে শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে গত ১৭ সেপ্টেম্বর '০৬ সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলভবন চত্বরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক রিকো চাকমা, ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মারমা ও বাসাবো শাখার মংয়ো মার্মা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ৪৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে। সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসত্তাগুলো আজ বাংলা ভাষার আধিপত্যে নিষ্পেষিত। দেশের প্রত্যেক জাতিসত্তা যাতে নিজ নিজ ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য তথা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অন্য সকল জাতিসত্তার সাথে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে পারে সে জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবশ্যই কর্তব্য।

বক্তারা বলেন, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের জনগণকেই নিজেদের মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশের জনগণের মহান আত্মত্যাগের স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশ বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষাগুলো অনাদরে, অবহেলায় ও অবজ্ঞায় পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের সাংস্কৃতিক সম্পদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের এই ভাষা সমূহের সংরক্ষণ, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোন সরকার আজ পর্যন্ত কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরসূরি। হাজার বছর ধরে নিজ নিজ ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করছি আমরা। অথচ আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে প্রতিক্রিয়াশীল এনজিও মার্কা সংগঠনের মাধ্যমে কুটকৌশল খাটিয়ে উপস্থাপন করা হয় আদিম হিসাবে, বিকৃতভাবে, অবজ্ঞা অপমান সূচক শব্দ 'উপজাতি বা আদিবাসী' বলা হয়। ভুলে যাওয়া হয় পরাক্রমশালী মোঘল শাসকের বিরুদ্ধে, আগ্রাসী ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসকে, অনুচ্চারিত হয় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা। আমরা আমাদের সঠিক ইতিহাস জানতে চাই। তাই আমাদের দাবি পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে জাতিসত্তার প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য বাদ দিতে হবে, পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী ও সঠিক সংগ্রামী ইতিহাস স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত সঠিক তথ্য সম্বলিত পরিচিতিমূলক রচনা বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, শিক্ষা ও চাকুরীতে পাহাড়িদের জন্য বিশেষ কোটা ব্যবস্থা চালু করতে হবে । বক্তরা অবিলম্বে শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

শহীদ রূপক চাকমার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১ সেপ্টেম্বর '০৬ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাসাবো শাখার উদ্যোগে শহীদ রূপক চাকমার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক রিকো চাকমা, ঢাকা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমেন চাকমা ও বাসাবো শাখার নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ইউপিডিএফ-এর নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে পুজগাঙস্থ মধুমঙ্গল পাড়ায় জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করে রূপক চাকমাকে খুন করে। জেএসএস-এর সন্ত্রাসীরা রূপক চাকমাকে হত্যা করলেও তার পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের চেতনা ও স্বপ্নকে হত্যা করতে পারেনি। শহীদ রূপকের চিন্তা-চেতনার অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে শত-সহস্র ছাত্র ও যুবক-যুবতি।

বক্তারা আরো বলেন, সেনাবাহিনী ও শাসক গোষ্ঠির প্রত্যক্ষ মদদে জেএসএস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অবাধে বিভিন্ন অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। সকল প্রকার বিভেদ, অনৈক্য এবং শাসক গোষ্ঠির কুমন্ত্রণার ফাঁদে না পড়ে শোষিত-বঞ্চিত পাহাড়ি জাতিসত্তার প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে 'পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের' পতাকা তলে সমবেত হওয়ার জন্য বক্তারা জেএসএস-এর প্রতি আহ্বান জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি রূপক চাকমা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সব সময় সামনের কাতারে ছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ এম.এ . ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি আত্ম প্রতিষ্ঠার মোহ ত্যাগ করে জনগণের কাতারে কাজ করার জন্য গ্রামে চলে যান। নির্বাচনে ইউপিডিএফ-এর পক্ষে লোকজনকে সংগঠিত করার জন্য পার্টি নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করতে পূজগাঙ যান। এ সময়ই জেএসএস-এর সশস্ত্র সদস্যরা তাকে খুন নির্মমভাবে খুন করে।

চট্টগ্রামে সদ্য কারামুক্ত ইউপিডিএফ সদস্যদের সংবাদ সম্মেলন

গ্রেফতারের পর সেনা সদস্যদের হাতে বর্বর অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরতে সদ্য কারামুক্ত কয়েকজন ইউপিডিএফ সদস্য চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

৩ অক্টোবর আয়োজিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে বাঘাইছড়ি থানা ইউনিটে দায়িত্বরত সুগত চাকমা অভিযোগ করেন, আটকের পর সেনা সদস্যরা তথ্য আদায়ের জন্য তার শরীরে বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে এবং অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, "গত বছর ২০০৫ সালের ৩০ জুন মধ্যরাতে (আন্তর্জাতিক সময় অনুসারে ১ জুলাই) রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি থানার মাজলং বাজারস্থ পুলিশ ফাঁড়ির সন্নিকট এক বাড়ী থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের ২ জনকে (আমি সুগত চাকমা ও মঙ্গল কান্তি চাকমা) সেনা সদস্যরা আটক করে। আমরা দুই জনেই ইউপিডিএফ'এর সক্রিয় সদস্য।

কিভাবে সেনা সদস্যরা আমাদের আটক করে এবং সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে তার ঘটনা আপনাদের নিকট বিবৃত করা দরকার। বাঘাইহাট সেনা জোনে সে সময় ২০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়োজিত ছিলো। স্থানীয় এক বাঙালী খুচরা ব্যবসায়ী রফিকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ২০ ইবি রেজিমেন্ট শীঘ্রই বদলী হয়ে যাবে। এ বেঙ্গলের (২০ ইবি রেজিমেন্ট) সিও (কমান্ডিং অফিসার) তার সময়ে তেমন কোন কাজ দেখাতে পারেননি। অর্থাৎ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী ধরতে পারেননি। তিনি কাজ দেখিয়ে প্রমোশন পেতে চান। তাই যাবার আগে সিও লেঃ কর্ণেল আব্দুর রব খান স্থানীয় খুচরা ব্যবসায়ী রফিকের মাধ্যমেই আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠান যে, আমরা যাতে তার প্রমোশনের স্বার্থে ২/৩ টা অস্ত্র যোগাড় করে দিই। তিনি এও প্রস্তাব দেন যে, তার সাথে বোঝাপড়া করে দেশীয় বন্দুক ও কিছু গোলাগুলি জুমের ঘরের মধ্যে রেখে দিয়ে আমরা যাতে তাকে খবর দিই, সে অনুযায়ী তিনি সেনা জওয়ান নিয়ে সে সব উদ্ধার করেছেন বলে প্রচার করতে পারবেন। আমরা সিও'র কথা মতো কাজ করলে তিনি আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। আর আমরা তার কথা মতো অস্ত্র ও গোলা বারুদ যোগার করে না দিলে তিনি নাকি আমাদের নানাভাবে ক্ষতি করবেন বলে হুঁশিয়ারীও দেন। আমরা সিও'র প্রস্তাব শোনার সাথে সাথে নাকচ করে দিই। আমরা সোজা জানিয়ে দিই আমাদের পক্ষে সে ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা পার্টি করি, অস্ত্র কারবার করি না। সিও বেশ কয়েক বার ঐ রফিক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে একই প্রস্তাব পাঠান। সিও এটাও নাকি রফিককে জানিয়ে দেন যে, আগে তো এভাবে অনেকে অস্ত্র যোগার করে দিয়েছে। 'তারা কেন দিচ্ছে না আমি তাদের দেখে নেবো' বলে বাঘাইহাটের সিও রফিক ব্যবসায়ীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। এখানে বলা দরকার যে, জেএসএস'এর কর্মিরা আগে এক সময় এ ধরনের কাজ করেছে। দ্রুত প্রমোশনের লোভে অনেক সেনা কর্মকর্তা গোপনে জেএসএস'এর কর্মিদের সাথে যোগাযোগ করে ভাঙাচোরা অস্ত্র ও অকেজো গোলা-বারুদ গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে জুম ঘর বা পরিত্যক্ত কোন জায়গায় রেখে আসতো, প্রমোশন আকাঙ্ক্ষী কর্মকর্তা সেনা জওয়ান নিয়ে সে সব উদ্ধার করতো। সে সব অস্ত্র ও গোলা বারুদ উদ্ধারের কাহিনী ফলাও করে জাতীয় দৈনিকে সেনা সূত্রের বরাত দিয়ে ছাপানো হতো। এভাবেই দেশে দুর্নীতি জালিয়াতি চলছে।"

তিনি আরো বলেন, "মাজলং বাজার থেকে আমাদের বাঘাইহাট সেনা ক্যাম্পে আনা হয়। সেখানে আমাদের উপর চলে ভীষণ অত্যাচার। আমাকে একটা আবদ্ধ রুমে ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়। তখন মনে হচ্ছিলো দুনিয়াটা ঘুরছে, আমি আর সহ্য করতে পারিনি। এক পর্যায়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমাকে বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় দু'ভাবে ঐ বৈদ্যুতিক শক দেয়। থানায় নেবার আগ পর্যন্ত আমাদের চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলো। টানা ৫ দিনের মতো বাঁধা থাকায় চোখ জমে যায়। প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। "সবচে' উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্য সেনা সদস্যরা চোখ বেঁধে আমাকে ইঞ্জেকশান পুশ করে দেয়। এতে এত জ্বালাপোড়া হয়েছিলো যে, মনে হয়েছে শরীর জ্বলে গেছে। ইঞ্জেকশান দেয়ার পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এক ক্যাপ্টেনের কাছে নেয়া হয়। গরু মহিষকে যেভাবে বেঁধে ইঞ্জেকশান দেয়া হয় আমাকেও সেভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। যে ইঞ্জেকশান পুশ করেছে সে আদৌ ডাক্তার কিনা আমার সন্দেহ হয়েছে। খুব জবরদস্তি করে ইঞ্জেকশান পুশ করে দেয়। সচরাচর নার্স বা ডাক্তাররা যেভাবে ইঞ্জেকশান পুশ করে সে রকম নয়। আমার চোখ বাঁধা ছিলো, কিছু দেখতে পাইনি। ইঞ্জেকশান পুশ করার পর বলে উঠে 'শালাকে আর একটা ইঞ্জেকশান পুশ করে দেবো নাকি?', পাশের একজনকে বলতে শুনি 'দিও না, তা দিলে পাগল হয়ে যাবে।'

এক জন সেনা কমান্ডার কত বর্বর হতে পারেন সে সম্পর্কে আভাস দিয়ে সুগত চাকমা বলেন, "আমাদের ধরার পর বাঘাইহাট সেনা জোনে রীতিমতো এক উৎসব অনুষ্ঠান হয়। আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে, সেনা অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল আব্দুর রব খান সে উৎসবে শরীক করার জন্য তার আপন বোনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে যান। সেনা অধিনায়ক তার সাফল্য ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কতখানি জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিলেন তা ঐ ঘটনা থেকে অনুমান করতে কারোর অসুবিধে হবার কথা নয়।"

অপরদিকে, তিনি টু-আই-সি তার সাথে মানবিক ও ভদ্র ব্যবহার করেন বলে জানান। তিনি বলেন, "বাঘাইহাটের টু-আই-সি (সেকেন্ড-ইন-কমান্ড) মেজর মোহাম্মদ কামরুল হাসান (বিএঃ ৪৫২৯) আমাকে সেনা জওয়ানরা বেঁধে তার কাছে নিয়ে গেলে 'উনাকে কেন বেঁধে এনেছো' বলে ধমক দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়ে সেনা জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বলেন,' উনি কি চোর না ডাকাত? উনি তো রাজনীতি করেন।' টু-আই-সি আমাকে চা খাওয়ার অফার দেন। আমার এমন অবস্থা ছিলো কোন কিছুতে রুচি ছিলো না। উনি আমার স্ত্রী কন্যার সাথে দেখা করারও ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানান।"

সুগত চাকমা দীর্ঘ এক বছরেরও অধিক সময় জেলে আটক থাকার পর গত ২৭ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন মঙ্গল কান্তি চাকমা। তিনিও একই দিন ছাড়া পান। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে তাদের সহযোগিতা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা।

ভরদ্বাজ মুনির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

১৩ অক্টোবর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রথম শহীদ ভরদ্বাজ মুনির ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে পানছড়ির পূজগাঙ স্কুল মাঠে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শীতেশ্বর চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমেন চাকমা, কেন্দ্রীয় নেতা ভবতোষ চাকমা, এইচ.ডব্লিউ.এফ নেত্রী দীপনা চাকমা ও ইউপিডিএফ নেতা নৈতিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি জেলা কমিটির নেতা সুকেল চাকমা। উপস্থাপনা করেন অর্পন চাকমা।

এছাড়া ইউপিডিএফ এর উদ্যোগে ভরদ্বাজ মুনির স্মরণে দিঘীনালার বাঘাইছড়ি দোর-এও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বক্তারা ভরদ্বাজ মুনির আত্মত্যাগের প্রতি গভীর সম্মান জানিয়ে বলেন, নিপীড়িত জনতার অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত শহীদদের রক্তের ঋণ শোধ করা যাবে না। তারা আসন্ন নির্বাচনে ইউপিডিএফ-কে জয়যুক্ত করার মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ত্বরান্বিত করার আহ্বান জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে ৭ দফা দাবি তুলে ধরতে ইউপিডিএফ-এর সাংবাদিক সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সেনা তৎপরতা-নির্যাতন বন্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি আলাদা আধা-স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫ অক্টোবর পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ৭ দফা দাবি তুলে ধরতে গিয়ে এ কথা বলেন। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ উক্ত দাবি আদায়ে আন্দোলনের কর্মসূচীরও ঘোষণা দেন।

লিখিত বক্তব্যে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে সেখানকার জনগণ ক্রমান্বয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সংসদীয় আসনগুলো পর্যন্ত হয় বহিরাগতদের কাছে নতুবা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার।"

নেতৃবৃন্দ হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ৫০ হাজার ভূয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেন এবং বলেন, যেখানে ক্ষমতাসীন দলের এমপির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও দাপট রয়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশী ভূয়া ভোটার রয়েছে এবং এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আগামী নির্বাচনে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কতিপয় কমান্ডার বিএনপি প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালায়। সম্প্রতি ২০ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটির কাউখালিতে অনুষ্ঠিত ৩ নং ঘাগড়া ইউপি উপনির্বাচনেও প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার ব্যাপারে একই ধরনের অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে তারা দাবি করেন।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ইউপিডিএফ ৭ দফা দাবি তুলে ধরে।

দেশে বিরাজমান অস্থির পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সংবিধানে ১৯৯৬ সালে প্রবর্তিত অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা শাসক গোষ্ঠির সাংবিধানিক সংকট দূর করার ক্ষেত্রে দ্রুত অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।" এই নির্বাচনী ও সাংবিধানিক সংকটকে দেশের বিরাজমান চরম বৈষম্যমূলক ও নৈরাজ্যিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই বাহ্যিক রূপ হিসেবে অভিহিত করে তারা বলেন, শাসকগোষ্ঠিভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে এ সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করার কোন সামর্থ্য নেই। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য দরকার প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে জনগণের ক্ষমতা কায়েম করা।

সংবাদ সম্মেলনে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ উক্ত দাবিসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, যৌক্তিক ও গণতন্ত্র-সম্মত অভিহিত করে সেগুলো আদায়ের জন্য এ্যাকশন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচীগুলোর মধ্যে রয়েছে ১১ অক্টোবর নাগরিক সভা, ১৭ অক্টোবর জেলা নির্বাচন অফিস অভিমুখে মিছিল ও নির্বাচন কমিশন বরাবরে স্মারকলিপি পেশ, ১২-২০ অক্টোবর বিভিন্ন থানার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় ও ২১ অক্টোবর তীর ধনুক মিছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচীগুলো খাগড়াছড়ি জেলায় পালন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিটের নেত্রী সমারী চাকমা। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ইউপিডিএফ নেতা সচিব চাকমা ও উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ মানিকছড়ি ইউনিটের সংগঠক হ্লামাপ্রু মারমা, পানছড়ির ইউনিটের সংগঠক অপু চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা, এইচ.ডব্লিউ.এফ. নেত্রী সুমনা চাকমা ও পিসিপি নেত্রী কণিকা দেওয়ান।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ৭ দফা দাবি মেনে নিন

১ম পাতার পর

অনিমেষ চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক ক্যহোচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা এবং গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলাস চাকমা।

সমাবেশ চলাকালে উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর একটি প্রতিনিধি দল জেলা নির্বাচন অফিসে স্মারকলিপি দিতে যায়। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি রীনা দেওয়ান ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা।

পুলিশ প্রথমে মিছিলটি শাপলা চত্বরে যেতে দিতে চায় নি। মিছিল শুরু হওয়ার আগে সকাল ১০টার দিকে থানা থেকে দু'জন পুলিশ অফিসার ইউপিডিএফ কার্যালয়ে এসে জানান থানা থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ারের বেশী যেতে পারবে না। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে উস্কানিমূলক বলে মন্তব্য করেন এবং প্রশ্ন করেন কেন মিছিল নির্বাচন অফিস পর্যন্ত যেতে দেয়া হবে না। উত্তরে তারা বলেন জেএসএস-এর জনৈক নেতা নাকি বলেছেন "ইউপিডিএফ-এর ছেলেরা খুবই উশৃঙ্খল, তাই ঝামেলা হতে পারে।" জেএসএস এর উক্ত নেতা এমন কথা বলেছেন কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবে এটা স্পষ্ট প্রশাসন অজুহাত দেখিয়ে ইউপিডিএফ-এর কর্মসূচী পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে।

ই.ইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের

১ম পাতার পর

রোহিঙ্গাদের ভোটার করার বিষয়েও জানতে চান।

ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ তাকে জানান পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো কার্যত সামরিক শাসন জারি রয়েছে এবং সেখানে কয়েক লক্ষ বহিরাগত ভোটার রয়েছে। এই পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। ভোট কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রশাসনের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। এমন জায়গায় ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যেখানে পাহাড়ি ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট প্রদানে সক্ষম হন না। রাঙ্গামাটি জেলায় অতি সাম্প্রতিক ২০ সেপ্টেম্বর কাউখালি ইউপি উপনির্বাচনের ঘটনা উল্লেখ করে তারা বলেন, সেখানে দুই তৃতীয়াংশ ভোটার পাহাড়ি হওয়া সত্ত্বেও সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণে একমাত্র পাহাড়ি প্রার্থী জিততে পারেননি। আগামী নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকার ব্যাপারে তারা গভীর আশঙ্কা ব্যক্ত করেন।

তারা আরো বলেন, বিএনপি-জামাত জোট সরকার প্রশাসনের প্রত্যেকটি স্তর দলীয়করণ করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ নন। বর্তমান ব্যবস্থাধীনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি'রই প্রভাবাধীন সরকার হবে বলে তারা মন্তব্য করেন।

ইউপিডিএফ নেতা প্রসিত খীসা বলেন, ইউপিডিএফ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম. এ আজিজের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না, ইউপিডিএফ দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান দেখাবে এবং সেই অনুসারে নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

ইউপিডিএফ-এর সাত দফা দাবি:

১ম পাতার পর

৩. পাহাড়ি জনগণের ভূমি বেদখল বন্ধ করা এবং ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৪. হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ভূয়া ভোটারদের বাদ দেয়া এবং যারা বাদ পড়েছেন তাদের তালিকাভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধ করা; ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য কেবল পুলিশদের নিয়োগ করা।

৬. দূরবর্তী পাহাড়ি এলাকার জনগণ যাতে সহজে ও অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সে সব এলাকায় তাদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চল বিধায় এ অঞ্চলের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে একটি আলাদা আধা-স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা।

কাউখালির ৩ নং ঘাগড়া ইউনিয়নের উপনির্বাচন: একটি মূল্যায়ন

গত ২০ সেপ্টেম্বর কাউখালি উপজেলার অধীন ৩ নং ঘাগড়া ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন চেয়ারম্যান চাথোয়াই প্রু কার্বারীর মৃত্যুতে উক্ত পদ শুন্য হলে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাত্র দুই জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তারা হলেন সুনেন্দু বিকাশ চাকমা ও জসিম উদ্দীন খোকন। শেষোক্ত জন হলেন একজন সেটলার। ইউনিয়নে মোট ভোটার সংখ্যা হলেন ১২ হাজার ৭৬৫ জন, যার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হলেন পাহাড়ি। অথচ ভোটের ফলাফলে দেখানো হয়েছে যে, স্বতন্ত্র প্রার্থী সুনেন্দু বিকাশ চাকমা (চেয়ার) পেয়েছেন মাত্র ৪ হাজার ৪শ ২৯ ভোট। অপরদিকে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দীন খোকন (হরিণ মার্কা) লাভ করেন ৫ হাজার ১ শ ১৫ ভোট।

নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। চট্টগ্রামের একটি দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ জানায়, "ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে গতকাল বুধবার রাঙ্গামাটি ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে ব্যাপক ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করেছে ভোটাররা। প্রতিদ্বন্দ্বী দু'প্রার্থীর সমর্থকদের প্রভাবে নির্বাচন কেন্দ্রগুলো ছিল জিম্মি। হুমকি-ধামকি আর কারসাজি সবই হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের নাকের ডগায়।"

চেয়ারম্যান পদ প্রার্থী সুনেন্দু বিকাশ চাকমাও নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোটদানে বাধা দান ও ভোটারদের ওপর মারধরের অভিযোগ এনেছেন। তিনি নির্বাচনের পরদিন চট্টগ্রামে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং ১১টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৬টিতে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "উক্ত উপ-নির্বাচনে গতকাল মোট ১১টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৬টিতে ভোট গ্রহণে চরম অনিয়ম, জালিয়াতি ও ভোটারদের মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে। এ কেন্দ্রগুলো হলো জনুমাছড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, বগাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, বেতছড়ি মাদ্রাসা কেন্দ্র, কাউখালি সদর কেন্দ্র ও কাশখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র। চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জসিম উদ্দীন খোকনের প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ও প্ররোচনায় তার সমর্থকরা এই সব ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে আসা নিরীহ পাহাড়ি ভোটারদের লাঠিসোটা দিয়ে মারধর, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং ভোট কেন্দ্র থেকে জোর পূর্বক তাড়িয়ে দেয়। এছাড়া ভোট দিতে আসার পথেও পাহাড়ি ভোটারদের আটকানো হয় এবং তাড়িয়ে দেয়া হয়। ভোটারদের এভাবে ভোটদানে বাধা দেয়া নির্বাচনী আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করলেও তিনি কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মতি জানান। পুলিশের নাকের ডগায় এ সব ঘটনা ঘটলেও পুলিশ সদস্যরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।"

এই নির্বাচনে পাহাড়ি প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য বাঙালী আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থকরা তাদের বিভেদ ভুলে গিয়ে এক জোট হয়। সেনাবাহিনীও নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। তারা নির্বাচনের কয়েকদিন আগে সুনেন্দু বিকাশ চাকমার সমর্থকদের ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে হুমকি দেয় ও সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়। পাহাড়ি গ্রামে সেনা টহল জোরদার করার নামে ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। মোট কথা, যে কোন উপায়ে একটি পক্ষকে জিতিয়ে দেয়ার জন্য প্রশাসনের একটি মহল ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। তারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানান ষড়যন্ত্র ও গোপন পরিকল্পনায় লিপ্ত থাকে।

সঙ্গত কারণে ঘাগড়ার উপনির্বাচন কতিপয় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এবং আগামীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা কতটুকু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছে। মোট কথা, ঘাগড়া ইউপি উপনির্বাচনের পর সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নতুনভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সামান্য একটি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনে যদি এভাবে প্রকাশ্যে ও উলঙ্গভাবে ভোট ডাকাতি করা হয়, তাহলে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। বিগত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়িতে কতিপয় সেনা কর্মকর্তা বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালালে তার প্রতিবাদ করা হয়। কিন্তু উক্ত সেনা কমান্ডারের বিরুদ্ধে কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

ভোটের সাথে পাহাড়িদের পরিচয় খুব বেশী সময়ের নয়। এ দেশের নির্বাচনে যে সব অপকৌশল প্রয়োগ, কারসাজি ও সুক্ষ্ম কারচুপি হয় সে সম্পর্কে সহজ সরল পাহাড়িদের তেমন কোন অভিজ্ঞতা নেই। ফলে নানান ষড়যন্ত্র ও ফন্দি ফিকির করে তাদের নির্বাচনে হারিয়ে দেয়া হয়। কাজেই ভোটের অঙ্ক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল আশা করতে হলে তাদের কি করণীয় তা সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়। অবশ্য সেনাবাহিনী ও প্রশাসন কোন প্রার্থীর পক্ষে থাকলে, সেই প্রার্থীর বিরুদ্ধে ৯৯ শতাংশ ভোট পেয়েও জেতা যায় না। আর ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের কথা তো বাদই দেয়া গেল। এটাকে নির্বাচন না বলে সেনাবাহিনীর পরিচালিত ও প্রযোজিত প্রহসন বলাই ভালো।

৩ নং ঘাগড়া ইউপি উপনির্বাচন: কেন্দ্র ভিত্তিক অনিয়মের চিত্র

১. কাউখালি সদর উপজেলা কেন্দ্র: প্রতিপক্ষ প্রার্থীর সমর্থকরা সকাল ১০টা থেকে শামুকছড়ি পাড়া, তালুকদার পাড়া ও কচুখালি উপর পাড়া থেকে আসা সাধারণ পাহাড়ি ভোটারদের হুমকি, ভয়ভীতি ও শারীরিকভাবে আঘাত করে। কেন্দ্রে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ফলে অনেক সাধারণ পাহাড়ি ভয়ে ভোট দিতে আসতে পারেনি। জসিম উদ্দীনের সমর্থকদের আক্রমণে ২০ জনের মতো ভোটার আহত হন। নির্বাচনী কর্মকর্তা, প্রশাসন, পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে। নির্যাতনের শিকার পাহাড়িরা নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে আশ্রয় নিয়ে অভিযোগ করলে প্রতিপক্ষের সমর্থক মো. জাফর পীং মো: রুহুল আমিন নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তার নিকট পায়ে ধরে মাফ চাইলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে কিংবা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

২. বেতছড়ি মাদ্রাসা কেন্দ্র: এই কেন্দ্রে জসিম উদ্দীনের সমর্থকরা বেতছড়ি এলাকার পাহাড়ি ভোটারদেরকে *২য় পাতায় দেখুন*

"সুনেন্দু বিকাশ চাকমা কিভাবে চেয়ারম্যান হয় দেখে নেবো"

- মেজর ইয়াসিন

২০ সেপ্টেম্বর কাউখালির ৩ নং ঘাগড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে এবং এটা স্পষ্ট যে প্রার্থী সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে জোর করে হারিয়ে দেয়া হয়েছে।

পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাচনে যে কোন প্রার্থীর পক্ষে যে কেউ প্রচারণা চালাতে পারে। এটা স্বীকৃতি একটি অধিকার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য অনেক অধিকারের মতো এই অধিকারও কাউখালি সাব জোন কমান্ডার মেজর ইয়াসিনের বুটের তলায় পিষ্ট হয়েছে। নির্বাচনের দুই দিন আগে গত ১৮ সেপ্টেম্বর তিনি ইউপিডিএফ সদস্য কংপ্রু চৌধুরী ও দিবাকর চাকমাকে তার ক্যাম্পে গোল ঘরে দুই ঘন্টা ধরে বসিয়ে রেখে নির্বাচন সম্পর্কে অহেতুক হয়রানিমূলক নানা প্রশ্ন করেন। কংপ্রু মেজরকে বলেন যে, ইউপিডিএফ উপনির্বাচনে কোন প্রার্থীকে প্রকাশ্যে কোন সমর্থন দেয়নি এবং কোন প্রার্থীর পক্ষেও প্রচারণা চালায়নি। সাধারণ ভোটাররাই স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

কংপ্রুর কাছ থেকে এ কথা শুনে মেজর ইয়াসিন রেগে যান এবং অভিযোগের সুরে বলেন, ইউপিডিএফ এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় মিটিং করে সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে ভোট দেয়ার জন্য লোকজনকে চাপ দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন "ইউপিডিএফ সুনেন্দুকে *৩য় পাতায় দেখুন*

ইউপিডিএফ নেতা রঞ্জন মনি চাকমার জামিনে মুক্তি লাভ

গত ২২ অক্টোবর ইউপিডিএফ নেতা রঞ্জন মুনি চাকমা ১৭ মাস পর খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন। তিনি ২০০৫ সালের ২৩ মে খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ হুয়াং বোই-ও-বা লাইব্রেরী থেকে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। এ সময় তার সাথে আরো গ্রেফতার হন ইউপিডিএফ নেতা সচিব চাকমাসহ অনেকে।

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নে সংসদ সদস্য ওয়াদুদ ভূঁইয়ার উদ্যোগে ও চার দলীয় জোট সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মোট ৬৫ হাজার অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সেটলার বাঙালিকে পুনর্বাসনের যে ষড়যন্ত্র চলছিল তা ঠেকানোর জন্য ইউপিডিএফ গত বছর ৭ জুন মহাগণসমাবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। গ্রেফতারের দিন হুয়াঙ বোইও বা লাইব্রেরীতে ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিট ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বসে উক্ত সমাবেশ সফল করার জন্য আলোচনা করছিলেন। মিটিঙের এক পর্যায়ে থানা থেকে এক দল পুলিশ এসে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ও বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের জেলে পাঠিয়ে দেয়। ৭ জুনের ভূমি বেদখল বিরোধী মহাসমাবেশ বানচাল করে দেয়ার জন্যই মূলত এভাবে গণগ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে ১৩ জন মুক্তি লাভ করেন। রঞ্জন মুনি চাকমা ছাড়া পাওয়ার পর বর্তমানে উক্ত ১৬ জনের মধ্যে দুই জন আটক রয়েছেন। তারা হলেন লংরাই ত্রিপুরা ও পিসিপি নেতা পুলক চাকমা।

রঞ্জন মুনি চাকমার এটা ছিল দ্বিতীয় কারাবাস। এর আগে তিনি ২০০০ সালের ১ জুলাই মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জুরাছড়ি বাজার থেকে গ্রেফতার হন। সে সময় তার বিরুদ্ধে সর্বমোট ৯টি মামলা দিয়ে নান্যাচর থানায় ৯ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ৯ মাস আটক থাকার পর তিনি ২০০১ সালের ১৩ মার্চ ছাড়া পান। দ্বিতীয় বার গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে মোট ৭টি মামলা দায়ের করা হয়। প্রথমে তাকে খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে ও পরে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়।

রুনা ধর্ষণ ও হত্যা

বাবা মা'র করুণ আকুতি: আমরা ন্যায় বিচার চাই

রুনা চাকমা

খাগড়াছড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর॥ "আমরা ন্যায় বিচার চাই। আমরা চাই দোষীদের শাস্তি দেয়া হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে কোন মেয়ে আমাদের মেয়ে রুনা চাকমার মতো ধর্ষণের শিকার ও খুন না হয় তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হোক।"

দিঘীনালার ছোট মেরুং-এ ধর্ষণের পর খুন হওয়া স্কুল ছাত্রী রুনা চাকমার বাবা জ্ঞান জ্যোতি চাকমা ও তার মা জয় সোনা চাকমা ২৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ জুম্ম ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির অফিসে সাংবাদিকদের সাথে আলাপ কালে এই আকুতি জানান।

তারা বলেন, "আমাদেরকে সব সময় সেটলারদের ভয়ে থাকতে হয়। আমাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।" রুনা ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চেয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে জ্ঞান জ্যোতি চাকমা বলেন, বিএনপি লোকদের হুমকির কারণে মামলা করা সম্ভব হয়নি।

তারা দোষীদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে সরকার দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ করেন এবং বলেন সরকারের এ ধরনের আচরণ স্বভাবসিদ্ধ। কারণ প্রত্যেকটি সরকার পাহাড়িদের দুরাবস্থার প্রতি চরমভাবে উদাসীন। তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা দাবি করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে কোন মেয়েকে তার ইজ্জত হারাতে না হয় তার নিশ্চয়তা বিধানের আহ্বান জানান।

রুনা চাকমার লাশ

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন তাদের আত্মীয় বিশ্বজিত চাকমা ও জ্যোতি প্রিয় চাকমা। তাদেরকে সাহায্য করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের অর্থ সম্পাদক মাইকেল চাকমা ও ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিটের নেত্রী সমারী চাকমা।

উল্লেখ্য, দিঘীনালার ছোটো মেরুং হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রুনা চাকমা (১৫) ২ সেপ্টেম্বর পরীক্ষা শেষে স্কুল থেকে ফেরার পথে কতিপয় সেটলার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণকারীরা পরে তাকে গলাটিপে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়। একদিন পর তার বিকৃত লাশ পাওয়া যায়। ঘটনার পর কয়েক জন সেটলার যুবককে আটক করা হলেও পরে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক দিঘীনালায় গিয়ে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেও, অপরাধীরা এখনো দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘটনার প্রতিবাদে দিঘীনালায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। এতে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক পাহাড়ি বাঙালি সবাই অংশ নেন। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু তবুও দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে এভাবে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আজ পর্যন্ত কোন হত্যাকান্ড, ধর্ষণ কিংবা অপহরণের বিচার হয়নি। ফলে অপরাধীরা বার বার পার পেয়ে যাচ্ছে এবং নতুন অপরাধ সংঘটনে ইনসেনটিভ বা উৎসাহ পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার বদলে তাদের পুরস্কারই করা হয়ে থাকে। সরকারের এ ধরনের আচরণ জনগণের মনে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কাজ করে। অদূর ভবিষ্যতে এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটলে তার জন্য অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

ঘিলাছড়ি ক্যাম্প কমান্ডারের বর্ণবাদী আচরণ

প্রখর, রাংগামাটি, ২২ অক্টোবর '০৬।

মধ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের নান্যাচর থানার ঘিলাছড়ি আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার পাহাড়িদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণ করছেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের পাঁয়তারা চালাচ্ছেন।

গত ১২ অক্টোবর ছিল ঘিলাছড়ি বাজারের হাট বার। পাহাড়িরা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী যেমন কলা, জাম্বুরা, আদাসহ বিভিন্ন তরি তরকারী এবং গৃহপালিত গরু, ছাগল মুরগী ইত্যাদি বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে আসেন। যথানিয়মে বাজার বসে এবং কেনা বেচা শুরু হয়। এমন সময় ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর মহুসিন (২৪ বেঙ্গল) তার দলবল নিয়ে বাজারে প্রবেশ করে সব বাঙালী ব্যবসায়ীদের ডেকে এক কোণায় নিয়ে যান। তিনি পাহাড়িদের কাছ থেকে উপযুক্ত দাম দিয়ে মালামাল না কেনার জন্য তাদের কড়া নির্দেশ দেন। তিনি বাঙালী ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "বাজারে নিয়ে আসা কাঁচামাল বিক্রি না করে কোন অবস্থাতেই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। যে দামেই হোক তাদেরকে বিক্রি করতেই হবে।" পাহাড়িদের এই দুর্বলতার সুযোগটি কাজে লাগাবার *২য় পাতায় দেখুন*

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ইউপিডিএফ কার্যালয়, স্বনির্ভর বাজার, উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি)